পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০২২

প্রদান উপলক্ষ্যে

স্মা র ক গ্র ন্থ

২০২৩

সম্পাদনা

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

স্বাগত ভাষণ ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ৯

বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ ॥ **পদ্মনাথ ভট্টাচার্য** ॥ ১০

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ২০

আজকের আমেরিকা (দ্বিতীয় ভাগ) ॥ **রামনাথ বিশ্বাস** ॥ ২১

কবিতা ॥ ৩০

অন্তরঙ্গ আলাপনের সংক্ষিপ্তসার ॥ ৩৪

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ ॥ ৩৮

স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ ॥ ৩৯

এ-যাবৎ পুরস্কৃত কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ৪০-৬৩

বানিয়াচঙের রাজবংশ : কুলপঞ্জি ॥ সংকলক : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৬৪

সম্পাদকের নিবেদন

এবারকার স্মারকগ্রন্থে পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৮-১৯৩৮) 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ' গ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৩২১ বঙ্গাব্দ) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (১৮৯৪-১৯৫৫) 'আজকের আমেরিকা' (দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৪৩) গ্রন্থের ধারাবাহিক মুদ্রণের পরিসমাপ্তি হলো।

আমরা উক্ত দুই লেখকের দুষ্প্রাপ্য অন্য গ্রন্থ উদ্ধার করে তা পূর্ববৎ ধারাবাহিক মুদ্রণের চেষ্টা করব। আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য স্মারকগ্রন্থের মান অক্ষুণ্ণ রাখা। ২০২২ সালের পুরস্কার প্রদান সভায় সম্মাননীয় অধ্যাপক ড. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ আমরা ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন, আমরা যেন ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের গ্রন্থগুলি উদ্ধার করি এবং তা সুসম্পাদিত করে প্রকাশ করি। সংস্থার মাননীয় সাধারণ সচিব শ্যামাশিস ভট্টাচার্য মহাশয় এই বিষয়টি বাস্তবে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের আশা -- আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজটি করে উঠতে পারব। গ্রন্থ উদ্ধার, যোগ্য সম্পাদনার সংকট ও আর্থিক দায়ভার তো আছেই, তবু হবে।

২০২২ সালের জন্য দুই কবি রবীন্দ্র সরকার ও মৃদুল দাশগুপ্তের পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দিত। আমরা এঁদের আনন্দ-উজ্জ্বল দীর্ঘ পরমায়ু প্রার্থনা করি।

আমার অগ্রজ সুকুমার বাগচির স্নেহ-ভালোবাসায় আমি আপ্লুত। তিনি ভিন রাজ্য থেকে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশে আমাকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করি।

শেষ কথা, সহৃদয় পাঠক এই স্মারকগ্রন্থটি পাঠান্তে লিখিত সমালোচনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠালে আমরা ঋদ্ধ হব এবং পরম কৃতজ্ঞতায় তা প্রকাশ করব।

স্বাগত ভাষণ

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের দ্বাদশ পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাউন্ডেশনের এগিয়ে চলার পথে নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত, একই সঙ্গে বেদনা অনুভব করছি তাঁদের প্রয়াণে যাঁরা নানা ভাবে আমাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাত্র মাস দুয়েক আগে, গত ১৯ জানুআরি আমরা হারিয়েছি বিশিষ্ট অসমিয়া কবি নীলমণি ফুকনকে। তিনি শুধু বড় মাপের কবিই ছিলেন না, দেশের সেরা সাহিত্য সম্মান জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন ২০২০ সালে। তা ছাড়া, ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন আমার পিতা রমানাথ ভট্টাচার্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও প্রেরণা-স্বরূপ। কবি হিসেবে বাবার সাফল্যের পিছনে নীলমণি ফুকনের অবদান অবিস্মরণীয়। এইসূত্রে তাঁর পরিবারের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক সমবেদনা।

এই মুহূর্তে আরো একজনের বিদায়-ব্যথায় আমরা কাতর। গত ১৫ মার্চ না-ফেরার দেশে চলে গেলেন কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা তথা সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ সন্দীপ দত্ত। গত কয়েক বছর ধরে তিনি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আমরা প্রয়াত উভয় সাহিত্যরসজ্ঞের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

গতবছর এপ্রিল মাসে আমাদের নতুন কর্মোদ্যোগে যুক্ত হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আয়োজিত রমানাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় অসমিয়া ও বাংলা ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী নবীন কবিদের পুরস্কৃত করা হয় ২০২২ সালের মে মাসে গুয়াহাটিতে 'ব্যতিক্রম' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। পুরস্কৃত ছয়টি কবিতাই এবারকার স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আপনারা দয়া করে কবিতাগুলি পড়বেন যাতে নতুন প্রজন্মের কবিরা উৎসাহিত বোধ করে, যাদের কেউ কেউ হয়তো আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছে।

তা ছাড়া, গতবার যেমন ঘোষিত হয়েছিল সেইভাবে ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত দুই কবি আনিছ উজ জামান এবং কালীকৃষ্ণ গুহ-র সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের এক সংক্ষিপ্ত বয়ান এই স্মারকগ্রন্থে মুদ্রিত হলো।

২০২২ সালের জন্য পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি রবীন্দ্র সরকার শারীরিক অসুস্থতার কারণে আজকের অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। গত ১৬ মার্চ কলকাতায় তাঁর বাসভবনে মানপত্র, সম্মান-স্মারক ও পুরস্কারের অর্থমূল্য শ্রীসরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার ভিডিয়ো এখানে প্রদর্শিত হবে।

প্রসঙ্গত বলি, এবারও আজকের অনুষ্ঠানে ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি মৃদুল দাশগুপ্তের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকছে, আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এটি আকর্ষক হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি। মূল্যবান সময় ব্যয় করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি
২৬ মার্চ ২০২৩

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৮ সালটি ছিল পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্মের সার্ধশত সমাপ্তিবর্ষ। ❑

বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য

দ্বাবিংশ দিবস, মঙ্গলবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ

বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর ও বদরীনাথ

জোশীমঠ হইতে বদরীনাথপুরী ১৯ মাইল। এই পথটা অদ্য অতিক্রম করিতেই হইবে, এই সংকল্প করিয়া আমরা ভোরে উঠিয়া মঠ পরিত্যাগ করিলাম। এখান হইতে সোয়া মাইল আন্দাজ খাড়া উৎরাই নামিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌঁছানো যায়। বিষ্ণুপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ এবং সোমপ্রয়াগেও সংগমস্থলে অত্যন্ত ভয়ানক স্রোতাবেগ। যাত্রীদিগকে তত্তৎস্থানে স্নানার্থ অতি সন্তর্পণে নামিতে হয়। কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগ ভীষণ হইতেও ভীষণতর। বাপ্, জলের কী বেগঙ্গ একদিক হইতে বিষ্ণুগঙ্গা, অন্যদিক হইতে অলকানন্দা— উভয়েই পর্বতদ্বয়-মধ্যস্থ সংকীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে— দুই স্রোতস্বিনীর সংঘর্ষণে কী এক ভীষণ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য, গর্জনে কান বধির হইয়া যায়— দর্শনে মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়।

ভীরু যাত্রীরা, বিশেষত স্ত্রীলোকেরা, প্রায়শ এই কাণ্ড দেখিয়া জলের কাছে আসিতে সাহসী হয় না। যাহারা প্রয়াগের স্নানফল পাইতে চায়, তাহারা প্রায়ই ঘটি দিয়া জল তুলিয়া স্নান করে।

আমাদের কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি হইল না। ডুব দিয়া স্নান করিতেই হইবে। একটু সাহস করিয়া নিকটে গিয়া উপায় উদ্ভাবন করা গেল। দুই স্রোতের সম্মিলনস্থানে স্নান করা মানবের অসাধ্য, তবে প্রস্তরময় সংগমস্থলে এমন স্বল্প-পরিসর কুণ্ড আছে, যাহাতে একটি লোক কোমর জলে দাঁড়াইয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে স্নান করিতে পারে। তথাপি একজন ঘাট-পুরোহিতের হাত ধরিয়া অতি সাবধানে নামিয়া অর্ধ মিনিট মধ্যে কাজ সারিয়া নিলাম। তৎপর তর্পণক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক ঘাটের উপরিস্থিত দেবালয়ে নারায়ণ সন্দর্শন করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। এখানেও একটি ক্ষুদ্র চটি আছে।

এখান হইতে যে-পথে চলিতে লাগিলাম, তাহা কেদারের পথের ন্যায় স্বল্পপরিসর এবং সড়কের উপরিভাগে মসৃণতা খুব কম। ফল কথা, জোশীমঠ পর্যন্ত নীতিপাসের পথ— তাহাতে সরকারের মনোযোগ বেশি— তৎপর যাত্রীর পথ। যাহা হউক, সরকার বাহাদুর কৃপা করিয়া যে-পথটি করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। জোশীমঠ হইতে ছাগল-ভেড়া দ্বারা বদরী পর্যন্ত মাল চালান হইয়া থাকে।

কিয়দ্দূর গিয়া আমাদের গোমস্তাঠাকুর অলকানন্দার দুই দিকে দুই খাড়া পাহাড় দেখাইয়া বলিলেন, এই দুই পর্বত কলির প্রকোপের সময় জোড়া লাগিয়া যাইবে, তখন বদরীর পথ বন্ধ হইবে।

মাইলখানেক আরো গিয়া একটা লোহার পুল পার হইলাম— তথা হইতে ৩ মাইল ঘাট চটি এবং তৎপর আরো আড়াই মাইল চলিয়া পাণ্ডুকেশ্বর পৌঁছিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বর চটি বেশ বড়— অনেকগুলি দোকান আছে। স্থানটি অলকানন্দার তীরে, কতকটা সমতলের ন্যায়। পাণ্ডুকেশ্বরে দুইটি মন্দির পাশাপাশি আছে— একটিতে যোগবদরীর মূর্তি, অপরটিতে ঠিক সেই মূর্তি, কেবল উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তদ্বয়ে ধৃত শঙ্খচক্র, চক্র-শঙ্খ পর্যায়ে ধৃত আছে। মন্দিরের পূজক যখন যোগবদরী দেখান, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে এই মূর্তি বদরীনাথের মূর্তির অবিকল সদৃশ। আমি লক্ষ করিলাম যে

দেবপ্রয়াগে দৃষ্ট বদরীর ছবিতে শঙ্খচক্রের পরিবর্তে শঙ্খ-পদ্ম ছিল। এখানে কোনো কিছু না-বলিয়া যখন নন্দপ্রয়াগে পণ্ডিত মহেশানন্দ শর্মার সঙ্গে চিত্রাদির সম্বন্ধে আলাপ হয়, তখন আমি শঙ্খ-পদ্মের কথা পাড়ি। মহেশানন্দ তৎপ্রকাশিত চিত্রের এই ভুল স্বীকার করিয়া বলেন যে, তাঁহার ডিজাইনে শঙ্খ-চক্র ছিল— ইউরোপীয় চিত্রকর চক্রটাকে ভ্রমে পদ্ম করিয়া ফেলিয়াছে— ভবিষ্যতে এই ত্রুটি সংশোধিত হইবেঙ্গ এ স্থানে বলা আবশ্যক যে, বদরীনাথের মন্দিরে যখন শ্রীমূর্তি দেখি, তখন হাতে যে কিছু আছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পারি নাই। প্রকোষ্ঠে যথেষ্ট আলোকাভাব অথচ নিকটে গিয়া দেখার রীতি নাই।

যোগবদরীর মন্দিরে একখানি তাম্রশাসন দেখিলাম। ইহার ৪ খানি ফলক, মুখপাতের ফলকখানির উপরিভাগে একটি বৃষভমূর্তি অঙ্কিত থাকায় উহা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে নীত হইয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যে চন্দনলিপ্ত হইয়া যাত্রীদিগকে প্রদর্শিত হইতেছিল এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা আদায়ের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। মন্দিরের পূজক ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, এই মন্দির মহারাজ পাণ্ডুর নির্মিত এবং এই তাম্রশাসনও তাঁহারই লিখিত। পাণ্ডু এইখানেই মৃগরূপী ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হন। তাঁহারই নামে স্থানের ও দেবতার নাম পাণ্ডুকেশ্বর হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনে কী লেখা আছে, পড়িবার অবসর পাই নাই, সে ক্ষমতাও নাই। তবে যে দুই-এক মিনিটকাল ফলকগুলি দেখিতে পাইয়াছি— ইহারই মধ্যে লক্ষ করিলাম যে অক্ষরগুলি দেবনাগরের ছাঁদেই বটে, তবে আসামের তাম্রশাসনগুলির মতো অনেকটা আধুনিক। বৃষমার্কা ফলকখানিই সবচেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চি x ১৮ ইঞ্চি হইবে— ইহাতে প্রায় ৪০টি পঙ্‌ক্তি আছে। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে প্রায় ৭০টি অক্ষর। অন্য তিনখানি ইহার অপেক্ষা পরিমাণে কিছু ছোট— লেখাও তেমন ঘন নয়। তথাপি ইহাতে যে-কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে তাহা বড় সামান্য হইবে না। কলিকাতায় আসিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে এইখানি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। তিনি ইহার অনুসন্ধান করিবেন বলিয়াছিলেন। তৎপর প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে জানিলাম যে, এইগুলি এইটকিন্‌সন্ সাহেবের কূমায়ূন নামক নিবন্ধে পাণ্ডুকেশ্বর ফলক নামে অভিহিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে।

পাণ্ডুকেশ্বরে মধ্যাহ্নকৃত্য সারিয়া ২টার সময় রওনা হইলাম। আধ মাইল গিয়া পথিপার্শ্বে শেষধারা নামক একটি প্রস্রবণ এবং শেষনাগের একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলাম। মন্দির মধ্যে একটি যন্ত্রাকারে অঙ্কিত চিত্র দেখিলাম— উহাই নাকি শেষনাগের পীঠ। এখান হইতে লামবাগড়া নামক চটি প্রায় আড়াই মাইল— এবং তথা হইতে হনুমান চটি ৪ মাইল। হনুমান চটির এই পথটি বড় সুবিধাজনক নহে— চড়াই উৎরাই অধিক না-হইলেও বড় কদর্য। পথে একটি স্থানে অলকানন্দার জলপ্রপাতের যে-মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছি— জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। ঈষৎ ঢালু হইয়া উচ্চ হইতে পতিত প্রস্তরাহত ফেনিল ও ইতস্তত কুসুমস্তবকাকারে বিক্ষিপ্ত সলিলরাশি কী অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছেঙ্গ তদুপরি সূর্যরশ্মি পতিত হইয়া ঊর্ধ্বোদ্‌গত জলকণাগুলিতে রামধনুর সৃষ্টি করিয়া ওই শোভা শতগুণে বর্ধিত করিয়াছে। এই নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের আরামদায়ক গুরুগম্ভীরধ্বনি উত্থিত হইতেছে, যেন প্রকৃতির রঙ্গালয়ের নেপথ্যে যুগপৎ শত শত মৃদঙ্গ আহত হইয়া সলিলের তাণ্ডব-নর্তনে অবিরাম তাল জোগাইতেছে। আমরা পথ ও পথশ্রম ভুলিয়া কিয়ৎক্ষণ বিমুগ্ধচিত্তে নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া এই সৌন্দর্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

হনুমান চটিতে পৌঁছিবার অল্প পূর্বে একটি স্থানে আমাদিগকে যবাদি দ্বারা হোম করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল— ওই স্থানে নাকি মরুৎ রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

আমরা প্রায় ৫টার সময় হনুমান চটিতে পৌঁছাই। তথায় হনুমানের মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে উদ্‌যুক্ত হইলে তত্রত্য দোকানদারদের কেহ কেহ আমাদিগকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল যে, পথ এত চড়াই যে আমরা রাত্রির কমে ধামে যাইতে পারিব না। তখন পথে শীতে কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা আজ গিয়া বদরী-নারায়ণ দর্শন করিব, এই দৃঢ় সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া নিষেধ না-মানিয়াই চলিতে লাগিলাম। প্রায় অর্ধেক পথ অতি সুন্দর— বিশেষ কোনো চড়াই পাওয়া গেল না। তৎপর ক্রমশ চড়াই আরম্ভ হইল। তুঙ্গনাথের চড়াই অপেক্ষা এই চড়াই অধিক নয়, বদরীধাম পর্যন্ত পৌঁছিতে আমরা পথে কুত্রাপি বিশ্রাম করি নাই।

পথিমধ্যে আমাদিগকে অল্পমাত্র জায়গা— পাঁচ-সাত হাত বরফ মাড়াইতে হইয়াছিল এবং একটি নদী— বোধহয় কাঞ্চনগঙ্গা পার হইতে জুতা খুলিতে হইয়াছিল। এইরূপ আর পূর্বে কোনোদিন হয় নাই।

দুই মাইল বাকি থাকিতে আমরা দ্রৌপদীর স্থান পাইলাম— সেখানে "চীর" অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া যাইতে হয়, আমরা পরিধেয় বস্ত্রের একটুকু ছিঁড়িয়া দিয়া গেলাম, আরো খানিকটা চড়াই উঠিলে পর বদরী-নারায়ণের শ্রীমন্দিরে ধ্বজা দেখিতে পাইলাম। এই স্থানের অল্প উপরে পথের ডানদিকে কুবের-শিলা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অনেকটা সমতল জমি প্রাপ্ত হইলাম। আমরা প্রায় ৭টার সময় অলকানন্দা পার হইয়া বদরীনাথের ধামে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই সর্ব প্রথম পোস্ট-অফিস পাইলাম— সেখানে আমাদের চিঠিপত্র খোঁজ করিলাম। হরিদ্বার হইতে বদরীর ঠিকানায় সঙ্গী ডাক্তারবাবুর নামে একখানি চিঠি লিখিয়া আসি, ওইখানি বদরীনাথে ৫ম দিনে পৌঁছিয়াছিল। বদরীনাথ হইতে কাশীতে একখানি চিঠি দিয়াছিলাম— উহা ৮ম দিনে তথায় পৌঁছায়। বদরীনাথের পোস্ট-অফিসে টেলিগ্রাফও আছে।

পোস্ট-অফিসে ডাক্তার জগদীশ বসু ও তদীয় সহধর্মিণীর নামে অনেক চিঠি দেখিলাম। কিন্তু তাঁহারা তখনও বদরী পৌঁছান নাই। ফিরিবার পথেও লালসাঙ্গা পর্যন্ত তাঁহাদিগের কোনো সন্ধান পাই নাই।

ক্ষুদ্র শহরটি বড় জনাকীর্ণ বোধ হইল। রাস্তার দুই ধারে ঘন-সন্নিবিষ্ট দোকান এবং উপরে-নীচে সারি সারি গৃহ। আমরা এক দ্বিতল গৃহের উপরের কুঠরিতে স্থান পাইলাম।

তখনও নারায়ণের সান্ধ্য আরতির অল্প বিলম্ব আছে জানিয়া আমরা তপ্তকুণ্ডে সন্ধ্যাদি করিতে গেলাম। এই শীতপ্রধান স্থানে তপ্তকুণ্ডের জল বড়ই আরামদায়ক। এই কুণ্ড বদরীর মন্দির ও অলকানন্দার মধ্যস্থলে অবস্থিত। দুই দিক হইতে দুইটি তপ্ত সলিল ধারা আসিয়া ইহাতে পড়িতেছে। আবার অপর দিক দিয়া জল নিঃসৃতও হইতেছে। কুণ্ডের গভীরতা প্রায় আড়াই হাত।

কুণ্ড হইতে অল্প দূর গিয়া আমরা অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া তোরণ দ্বার পাইলাম।

ইহার মধ্য দিয়া আমরা নারায়ণের মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে প্রবেশার্থ দুইটি দ্বার— একটি পূর্বদিকে, অপরটি দক্ষিণ দিকে। উভয় দ্বারে ভয়ানক জনতা দেখিলাম এবং সেই জনতার অধিকাংশ ভাগ বাঙালি।

তখন ভোগ নিবেদন হইতেছিল। মন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের সন্নিকটেই লক্ষ্মীর মন্দির। তৎসংলগ্ন এক প্রকাণ্ড গৃহে ভোগ পাক হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের ন্যায় এখানেও লক্ষ্মীর পাক করা অন্নব্যঞ্জনের ভোগ হইয়া থাকে, তবে তথাকার ন্যায় এখানে ৫২ ভোগ নাই, ভোগের অন্নব্যঞ্জনও তেমন পরিষ্কার নহে।

জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় এই মহাপ্রসাদেও স্পর্শ-দোষ নাই, কিন্তু পাণ্ডুকেশ্বর পর্যন্ত নাকি এই ধামের সীমা, তাহার বাহিরে প্রসাদ নিতে নাই। এই প্রদেশের খাদ্য রুটি, কিন্তু নারায়ণের ভোগে অন্নের ব্যবহার। অন্নেরই জয় দেখিয়া অন্নগত প্রাণ অস্মাদৃশ বাঙালির মনে শ্লাঘা হওয়া স্বাভাবিক।

ভোগ নিবেদিত হইয়া সরানো হইলে আমরা জনতা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। যতটা নিকটে যাইতে পারা যায় গেলাম। নারায়ণের মূর্তি তখন পুষ্পমাল্যে ভূষিত— প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যতদূর পারা যায় দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। এতদিন ব্যাপী পথক্লেশ সার্থক হইল মনে করিলাম।

দর্শনান্তে বাসায় ফিরিয়া গেলে পাণ্ডাজি আমাদের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। অন্ন, ডাল, তরকারি, পাঁপড়ভাজা, কিঞ্চিৎ চাটনি ও লাড্ডু এই দিনকার প্রাপ্ত মহাপ্রসাদ।

রাত্রিতে দ্বার জানালাদি বন্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। শীত কেদার অপেক্ষা অনেক কম বোধ হইল। কিন্তু মধ্য রাত্রিতে শ্বাস টানিতে যেন কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারবাবু তাঁহার হৃৎপরীক্ষাযন্ত্র লাগাইয়া বলিলেন, কোনো ভয় নাই। বদরীর উচ্চতা নিমিত্ত তত্রত্য বায়ু কিছু লঘু তজ্জন্যই শ্বাস-প্রশ্বাস মধ্যে মধ্যে এরূপ হয়। কিন্তু বোধ হয় ইহা সেই দিনকার চড়াই উঠার ফলও হইতে পারে।

ত্রয়োবিংশ দিবস, বুধবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ

বদরীতে অবস্থান

পরদিন প্রাতে প্রথমত তপ্তকুণ্ডে স্নান-তর্পণ করা গেল। তৎপর তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্ত কেদারের ন্যায় পার্বণানুকল্প ভোজ্যদান হইল। সাড়ে আটটার সময় বদরীনাথের স্নানকালীন দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে গেলাম। লোকে লোকারণ্যঙ্গ যাহা হউক, দেখিলাম তখন রাওল সাহেব স্বয়ং পাজামা আচকান টোপ প্রভৃতি পরিয়া নারায়ণের উপর জল ঢালিতেছেন— রাওল সাহেব ভিন্ন কেহ নারায়ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। নারায়ণের মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের, একহাত পরিমিত উচ্চ— দূরে থাকাতে সমস্ত অবয়ব সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তবে দেহ সংস্থান যে প্রচলিত চিত্রের অনুরূপ, তাহা বেশ বুঝা যায়। নারায়ণের পার্শ্বে অন্যান্য মূর্তি অস্পষ্ট দৃশ্য। তবে চিত্রে উদ্ধব নারায়ণাদিকে যেভাবে অঙ্কিত

করা হইয়াছে, সেরূপ কিছু দেখিতে পাইলাম না। ফলত চিত্রটি অতিরঞ্জিত।

দুইটি প্রবেশ-দ্বার ব্যতীত মন্দিরের মধ্যে আলো আসিবার ব্যবস্থা নাই। প্রবেশ দ্বার দিয়া মন্দিরের সম্মুখের বড় হলটিতে অর্থাৎ জগমোহনে যাওয়া যায়। তৎপর পশ্চিমাভিমুখে নারায়ণের প্রকোষ্ঠের পোর্টিকোর ভিতর ঢুকিয়া বড়জোর উহার দ্বারদেশ পর্যন্ত যাওয়া যায়। পূজাদি শেষ হইলে ওই পোর্টিকোর প্রবেশপথ বন্ধ হইয়া যায়। জগমোহনের প্রবেশদ্বার অন্তত দক্ষিণেরটি সর্বদা খোলা থাকে। তবে দর্শনের সময় পাহারা বসে, যাহাতে সমস্ত লোক যুগপৎ উহাতে না-ঢুকিতে পারে। সন্ধ্যার পূর্বে অথবা পরে আবার ভিতরের দ্বার খুলে, তখন ভোগ আরতি হইয়া নারায়ণের শয়নের নিমিত্ত ওই দ্বার বন্ধ করা হয়।

বদরীধামে তুলসী পাওয়া যায় না। ডাক্তারবাবু সঙ্গে করিয়া তুলসী লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অন্যান্য উপহারের সঙ্গে নারায়ণকে অর্পণ করা হইল।

যাহা হউক, আমরা নারায়ণের স্নান দেখিয়া এবং সেখানে উপহার চড়াইয়া আসিয়া পিণ্ডদানার্থ ব্রহ্মকপাল-তীর্থে গেলাম। ইহা বদরীর মন্দির হইতে অল্প দূরে ঈশান কোণে অলকানন্দার তীরে। ওই স্থানের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র এবং নাকি আমাদের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত। পূর্বে মন্ত্র জানা থাকিলে উঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র বুঝিতে ক্লেশ হয় না। ইঁহাদিগকে যথোচিত দক্ষিণাদি দিয়া ওই স্থানে অলকানন্দার ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ করা গেল। তার পর সেই স্থানের এক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি করিয়া আরো দুই-এক জায়গায় দক্ষিণাদি দিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত হইলাম।

তখন সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইল। জগন্নাথ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাদির ভোজন মহাপ্রসাদ দ্বারা হয়, এক্ষেত্রে তাহা হইলে রাত্রি হইয়া পড়ে বলিয়াই হউক বা ভোজনকারীগণ অন্ন অপেক্ষা পুরি হালুয়াদির পক্ষপাতী বলিয়াই হউক, লক্ষ্মীর পাকশালায় প্রস্তুত দ্রব্যের পরিবর্তে হালুইকর ঠাকুরের দোকানের জিনিসই ভোজনার্থ আমদানি করিতে হইল। আমাদের সংকল্পিত সংখ্যা অপেক্ষা দু-চারিটি অধিক খাওয়াইতে হইল, কেননা অনাহূত ভাবে কয়েকজন আসিয়া ভোজনস্থানে বসিয়া গেলেন। ব্যয় হইল জন প্রতি প্রায় আট আনা।

পাণ্ডা চন্দ্র প্রসাদকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালে ৮টার পূর্বে আমাদেরই বাসার অঙ্গনে প্রত্যাবর্তনেচ্ছু যজমানদিগকে সুফল প্রদান করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেলা ৩টা পর্যন্ত সেই কার্য সম্পাদন করিয়া পরে স্নানাহার করিতে পারিয়াছিলেন। শুনিলাম, কোনো কোনো দিন হাজার টাকা পর্যন্ত পাণ্ডা বিশেষের আয় হইয়া থাকে। এখন ব্যাপার বুঝুনঙ্গ তবে যাত্রীদের নিকট হইতে বেশি পরিমাণে টাকা আদায়ের জন্য বক্তৃতা ও পীড়াপীড়িতেই তাঁহাদের সময়ের বেশিরভাগ ব্যয়িত হইয়া থাকে। গয়ার ন্যায় এখানেও সুফলের টাকা সমগ্র দিতে না-পারিয়া অনেকে খত দিয়া যায়।

অপরাহ্ণে মন্দিরে গিয়া গীতা পাঠ করা গেল এবং বাসায় বসিয়া বদরীনাথ মাহাত্ম্যও পড়া গেল। বদরী-মাহাত্ম্যে অনেক কথা জানা যায়, যাহা পাণ্ডা বা গোমস্তা হইতে জানিতে পারা যায় না। আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর পঞ্চশিলার মধ্যে কুবের শিলারও নামও বলিয়াছিলেন— অথচ ওই শিলা পুরীর বাহিরে অবস্থিত এবং পঞ্চ শিলা (নারদ শিলা, বরাহ শিলা, নরসিংহ শিলা, গরুড় শিলা ও মার্কণ্ডেয় শিলা) মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গণনীয় নহে।

তপ্তকুণ্ড ছাড়া ঋষিগঙ্গা, কূর্মধারা, প্রহ্লাদধারা, নারদকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড প্রভৃতিতে স্নান বা মার্জনা করিতে হয়।

গরুড়গঙ্গা হইতে আহৃত শিলাখণ্ডগুলি তপ্তকুণ্ড নারদকুণ্ডাদিতে প্রক্ষালন করিয়া গরুড়শিলাতে স্পর্শ করাইতে হয় এবং তৎপর বদরীনাথের মন্দিরে ছুঁয়াইয়া আনিতে হয়। এই শিলাখণ্ড ঘরে থাকিলে নাকি সর্পবৃশ্চিক প্রভৃতির দ্বারা গৃহস্থের অনিষ্ট হইতে পারে না।

আমরা সায়ংকালে আরতি দেখিবার জন্য মন্দিরে গিয়া দেখিলাম— বদরীনাথের আরতি পূর্বেই হইয়া গিয়াছে— ভিতরের কপাটও বন্ধ হইয়াছে। বাসায় আসিয়া পাণ্ডা প্রেরিত মহাপ্রসাদ পাইলাম— আজ লাড্ডু ও পাঁপড় নাই, প্রসাদের পরিমাণও পূর্বদিন অপেক্ষা কম।

চতুর্বিংশ দিবস, বৃহস্পতিবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ

বসুধারা

ভোরে উঠিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নানাদি সমাপন পূর্বক নারায়ণের স্নান দর্শনান্তে বসুধারা দেখিবার জন্য প্রায় ৯টার সময় রওয়ানা হইলাম। বসুধারা বদরীপুরী হইতে উত্তর দিকে ৫ মাইল। সেই স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে না— অতএব সঙ্গে কিছু খাবার নিয়া চলিলাম। পুরী হইতে প্রায় দেড় মাইল গিয়া পুল পার হইয়া একটি গ্রাম পাওয়া যায়, ইহার নাম 'মণিভদ্রপুর', ডাকনাম 'মানা'। ইহার নিকটেই গণেশগুহা। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব ও গণেশ এখানে বসিয়া পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন। ব্যাস-গুহার কথা কেহ

কিছু বলিতে পারে না, অনেকে গণেশগুহাকেই ব্যাস-গুহা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে।

এই স্থান হইতে সরস্বতী-গঙ্গার তীর দিয়া চলিয়া, আরেকটি ছোট পুল পার হইয়া, পাহাড় ছাড়াইয়া বসুধারার জলপ্রপাত দেখিতে পাইলাম। উচ্চ পর্বত-পৃষ্ঠ হইতে ধারাকারে জল পড়িতেছে, কিন্তু ওই ধারা বায়ুতাড়িত হইয়া বৃষ্টির ন্যায় বিক্ষিপ্তভাবে নীচে পড়িতেছে।

ধারা দেখা গেলেও ওই পর্বতের নিকট পৌঁছিতে আমাদের অনেক সময় লাগিল। পথ তেমন আর স্পষ্ট চিনা যায় না, যাহা হউক ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। বাতাস বহিতেছিল, উত্তরদিকে কেবল বরফ— বরফের ময়দান দেখিলাম। পথেও কিছু কিছু বরফ পাইলাম। তার পর একটু খাড়া চড়াই উঠিয়া যে-স্থানে ধারা পড়িতেছিল, তাহার সন্নিকটে একটি কুটিতে শীতে কাঁপিতে কাঁপতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই কুটিরের দুই দিকে দুই জন সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন— কাহারও সঙ্গে শব্দ করেন না। আমাদের পূর্বে কতকগুলি পাঞ্জাবি স্ত্রী-পুরুষ ওই কুটিরে আশ্রয় লইয়াছিল, আমরাও গিয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধুনিতে আগুন তাপাইতে লাগিলাম। সন্ন্যাসীরা ওইখানেই থাকেন, যাত্রী কেহ কেহ গেলে তাঁহাদিগকে পয়সা, খাদ্যদ্রব্য ইন্ধনাদি দিয়া আইসে। কুটিরের বাহিরে একজন ব্রাহ্মণ কতকগুলি দেবমূর্তি লইয়া বসিয়া আছেন— যাত্রীরা বসুধারায় স্নান করিয়া ওই স্থানেও কিছু দিয়া থাকে।

গোমস্তাজি সঙ্গে ছিলেন— বলিলেন, বসুধারার জল পাপীর উপর বর্ষে না। শুনিয়া কিছু চিন্তা হইল। তারপর দেখিলাম, সকল যাত্রীই ধারার নীচে গিয়া ভিজিয়া আসিল। তখন মনে হইল, যখন নারায়ণদর্শন হইয়াছে, তখন আর পাপীর পাপ থাকে কোথায়? তাই সাহস করিয়া ধারার নীচে গিয়া বৃষ্টির জলে স্নাত হইয়া আসিলাম।

বরফ-সংকুল স্থান স্বভাবতই শীতল, আবার বাতাস বহিতেছিল— জলও ভয়ানক শীতল— তাই একেবারে জড়সড় হইয়া গেলাম।

ধারা হইতে ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া কোনো প্রকারে তর্পণ-ক্রিয়া সম্পাদন পূর্বক আবার কিঞ্চিৎ আগুন তাপাইয়া সন্ন্যাসীদ্বয়কে প্রণাম করিয়া অবতরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর নামিয়া আসিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কাছে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। পুনর্বার পথ চলিবার পূর্বে একবার উত্তরদিকে তাকাইয়া আমাদের যাত্রার শেষ সীমা দেখিয়া লইলাম। ইহার উত্তরে যাইতে হইলে বরফ ভাঙিয়া চলিতে হয়। শুনা যায় যে এদিকে অলকানন্দার উৎপত্তি স্থান দর্শনার্থ সাধু-সন্ন্যাসীরা যান— এবং 'সত্যপদ' নামক একটি কুণ্ডও নাকি ওই দিকে আছে— ওইখানে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

যে-পর্বতপৃষ্ঠা হইতে বসুধারা পড়িতেছে, উহাতে নাকি কুবেরের ভাণ্ডার আছে, এবং তদ্বিপরীত (পশ্চিম) দিকস্থিত পাহাড়টির নাম নাকি গন্ধমাদন।

যাত্রীদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই বসুধারায় আইসে। বাস্তবিক বসুধারা যাতায়াত অসুবিধাকরই বটে।

ফিরিবার সময় প্রায় দুই মাইল আসিয়া ছোট পুলটি পাইবার পূর্বে ডানদিকের পথ হইতে অল্প দূরে একটি ক্ষুদ্র মন্দির দেখিতে পাইয়া আমি একাকী ওই নির্জন স্থানে গেলাম— দেখিলাম, এক দেবমূর্তি এবং তৎপার্শ্বে একটি খড়্গ। পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকেরা এখানে পাঁঠা ভেড়া চড়াইয়া থাকে।

যখন পূর্বকথিত মানা গ্রামের নিকটে আসিলাম, তখন নদীর অপর পারে পাহাড়ের পৃষ্ঠে অন্য একটি দেবালয় দেখা গেল। গোমস্তা বলিলেন, ওইটি বদরী-নারায়ণের মায়ের— মূর্তিমাতার মন্দির।

আমরা পুলে নদী পার হইয়া বদরি অভিমুখে না-গিয়া বিপরীতদিকের পথ ধরিয়া পাহাড়ের খানিকটা উঠিয়াই মন্দির পাইলাম। মন্দিরের নিকটে ঘর দেখিলাম— কিন্তু জনপ্রাণী কাহাকেও সে-স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

তথা হইতে ফিরিয়া আমরা বদরীপুরীতে প্রায় সাড়ে চারিটার সময় পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার সময় গরুড়াদিশিলা এবং কুণ্ডগুলি দেখিলাম। কূর্মধারার কাছে বদরীনাথের মূর্তি কিনিতে পাওয়া যায়— তামা-রুপা প্রভৃতি ধাতুর পাতের মধ্যে ছাঁচে গঠিত মূর্তি। একটি আনিতে ইচ্ছা ছিল— অনেকেই কেনে, কিন্তু গোমস্তা বলিলেন, ইহা নিলে সর্বদা ইহার নিয়মমতো পূজা করিতে হইবে— তাই নিরস্ত হইলাম। মূর্তি অনেকটা ছাপানো ছবির মতো।

সন্ধ্যার সময় আরতি দর্শন-ব্যাপদেশে মূর্তির শেষ দর্শনের জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে গেলাম। এই দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নারায়ণ সকলকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। আমরা বদরীবিশালজিকে পুনঃপুন প্রণাম পূর্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় আসিয়া পাণ্ডা

চন্দ্রপ্রসাদ-প্রেরিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলাম— সেই দিন প্রসাদ কেবল ডাল ও ভাত— পরিমাণেও খুবই কম।

আমরা দুইজনে রাত্রিতে একটি ছোট শয়ন-কুঠরি ও তৎসম্মুখস্থ বৈঠকখানার ন্যায় একটি প্রকোষ্ঠ দখল করিয়াছিলাম। বাঙালিবাবু, কাজ অনেক চায়— কিন্তু হয়তো পয়সা দিবার সময় কম দিবে— এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া পাণ্ডাজি ক্রমশ আমাদের প্রতি শিথিল-প্রযত্ন হইয়াছিলেন— এমন-কি আমরা বসুধারা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে আমাদের ছোট কুঠরির সম্মুখস্থ বড় কোঠা এক 'শেঠজি'র অধিকারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাই আর বদরিকাশ্রমে বাস করা সংগত বিবেচিত হইল না। কী জানি আবার ধনঞ্জয় পর্যন্ত যদি ঘটেঙ্গ আমাদের ত্রিরাত্র বাসও একপ্রকারে এই রাত্রিতেই হইয়া যায়। এই জন্য আমরা সেই রাত্রিতেই পাণ্ডার কাছ হইলে 'সুফল' লইয়া বিদায় হইয়া থাকিলাম। সুফলের সময় পাণ্ডাজি প্রায় দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া যখন দেখিলেন যে আমরা যাহা দিতে সংকল্প করিয়াছি তাহা আর বাড়িবে না, তখন বক্তৃতা বন্ধ করিয়া যথারীতি আশীর্বাদাদি করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন— আমরাও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বদরিকৃত্য শেষ করিয়া শয্যায় আরামে নিদ্রা গেলাম।

জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ন্যায় এখানে আট্‌কার প্রথা আছে। তবে সেই ব্যাপার নাকি রাওলসাহেবের দরবারে সম্পাদন করিতে হয়। ইহাতে পাণ্ডাজির কোনো স্বার্থ নাই বলিয়াই হউক, বা অন্য কোনো কারণেই হউক, তদর্থে আমাদিগকে কেহ ঘাঁটায় নাই— আমরাও তজ্জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম না যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহা করিব।

পঞ্চবিংশ দিবস, শুক্রবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ

বদরি হইতে প্রত্যাবর্তন

খুব ভোরে, প্রায় ৪টার সময় উঠিয়া আমরা বদরিনারায়ণকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলাম। আমরা পুল পার হইয়া পুরী ছাড়াইয়াছি— অমনি টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বাতাস বড় বেশি ছিল না— তথাপি শীতপ্রধান স্থান— বৃষ্টির মধ্যে চলাতে শীত বেশ লাগিতেছিল।

উৎরাই নামা, তাহাতে পথও একটু পিছল, সুতরাং সাবধানে চলিতে হইয়াছিল। আমরা প্রায় ৭টার সময় হনুমান চটিতে পৌঁছিয়া সেইখানেই প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম। গোমস্তা ঠাকুর পাণ্ডার সঙ্গে দেনাপাওনা চুকাইবার জন্য আমাদের সঙ্গে রওয়ানা হইতে পারেন না— আসিবার তেমন প্রয়োজনও নাই, কেননা, বদরি পৌঁছাইয়া দিলেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া যায়। তথাপি তাঁহার বাড়ি দেবপ্রয়াগের দিকে, আমাদের সঙ্গে বহু দূর একসঙ্গে গেলে যাওয়াও যায়— গেলে বকশিশের পরিমাণও কিছু বাড়িতে পারে— অথচ বদরিতে থাকিয়াও কোনো লাভ নাই— হরিদ্বার হইতেই যাত্রীর সঙ্গ পাওয়া যায়। তাই গোমস্তা শ্রীবল্লভীদত্ত শর্মাজি প্রায় ৬টার সময় বদরি ছাড়িয়া সাড়ে সাতটায় আমাদের সঙ্গে জুটিলেন। হনুমান চটি হইতে লামবাগড়ার পথের কর্দম ও পিচ্ছিল প্রস্তর বিশিষ্ট উদ্‌ঘাতিনী ভূমিতে চলিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইল— বৃষ্টি কিন্তু হনুমান চটিতেই থামিয়াছিল। যাইবার সময় শেষধারায় স্নান-তর্পণ করিতে পারি নাই, তাহা শেষধারায় স্নান করিয়া পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া মধ্যাহ্নকৃত্য করা গেল। তৎপর সেখান হইতে চলিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে আসিয়া জোশীমঠের পথে না-গিয়া, যে-পথ আসিবার দিন বামদিকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, ওই পথে গিয়া সেই ক্ষুদ্র চটির নিকটে প্রশস্ত পথে পড়িলাম। চটিতে লোক অনেক, স্থান না-পাইয়া পুনরপি পথ চলিতে লাগিলাম— দুই মাইল আসিয়া সিমুলি চটিতে কোনো প্রকারে একটু জায়গা করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম। বদরী নারায়ণ হইতে এই চটি ২২ মাইল আন্দাজ।

ষড়্‌বিংশ দিবস, শনিবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ

লালসাঙ্গা

এইদিন একাদশীর উপবাস, তাই পূর্ব রাত্রিতে কিছু লুচি-তরকারি গোমস্তার দ্বারা পাক করাইয়া খাওয়া হইয়াছিল। চটিতে দুধ পাওয়া গেল না, অথচ কদর্য বলিয়া জলও পান করা হয় নাই। ইহাতে আমাশয়ের ভাব দেখা গেল। আমরা চলিয়াছিও দ্রুত বেগে। পূর্বাহ্নে পাতার গঙ্গায় স্নানাদি করিয়া কিছু জলযোগ ও দুগ্ধপান করা হইল। তৎপরে অবিশ্রান্ত চলিয়া ৬টার সময় লালসাঙ্গা বা চমৌলি পৌঁছিলাম। পুল পার হইয়া এইবার স্থানটি দেখিয়া লইলাম। অনেক দোকানপাট আছে— থাকিবার গৃহগুলিও প্রশস্ত। এখানে পোস্ট অফিস (টেলিগ্রাম-সহ) ও ডিসপেন্সারি আছে। এখানেই অবস্থান করিতাম কিন্তু পরদিন নন্দপ্রয়াগে স্নানাদি কৃত্য করিতে হইবে তাই আরো ২ মাইল গিয়া কমল চটিতে অবস্থান করিলাম। এইদিন আমরা প্রায় ২৭ মাইল চলিয়াছিলাম, ইহাই আমাদের পর্বত লঙ্‌ঘনের দীর্ঘতম পথ। রাত্রিতে ডাক্তারবাবু ঔষধ দিলেন— আমাশয়ের উপশম হইয়াছিল— কিন্তু অর্শের ন্যায় একটা বেদনার উৎপত্তি হইল, ইহাতে অবিশিষ্ট পথে কষ্ট

পাইতে হইয়াছিল।

সপ্তবিংশ দিবস, রবিবার ২২শে জ্যৈষ্ঠ

নন্দপ্রয়াগ

লালসাঙ্গার পর হইতেই আমাদের পক্ষে নূতন পথ আরব্ধ হইয়াছে। কমলচটি হইতে নন্দপ্রয়াগ সাড়ে পাঁচ মাইল হইবে— অর্ধ পথে একটি সুন্দর চটি আছে— নাম মাটিয়ানি চটি। নন্দপ্রয়াগে একটি বাজার ও পোস্ট অফিস আছে। বাজারে গিয়া প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক শ্রীযুত মহেশানন্দ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল— তাঁহার কাছ হইতে আরো কিছু পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া— কিছু নোট ও গিনি ভাঙাইয়া নেওয়া গেল, কেননা যত্রতত্র এই সকল ভাঙানো যায় না— কেবল ত্রিযুগী, কেদার ও বদরিতে পাণ্ডাদের কাছে ভাঙাইতে পারা গিয়াছিল। কান্ডিওয়ালা নোট বা গিনি নিবে না— তাই তাহার জন্য এখানে টাকা সংগ্রহ করা হইল। পণ্ডিত মহেশানন্দ কেবল পুস্তক-বিক্রেতা নহেন, তাঁহার শিলাজতু বা শিলাজিত প্রভৃতি ঔষধেরও কারবার আছে। আমরা অন্যত্রও— যথা কুমারচটি হনুমানচটি ইত্যাদিতে— শিলাজতুর পাট্টাদার দেখিয়াছি। ইহারা পাহাড় হইতে শিলাজিতের মাটি-পাথর সংগ্রহ করিয়া আনে— এবং আয়ুর্বেদোক্ত রীতিতে রৌদ্রের গরমে তপ্ত করিয়া বিশুদ্ধ শিলাজিত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে।

শিলাজিত ছাড়াও স্বর্ণমাক্ষিক, ডলু, নির্বিষা প্রভৃতি অনেক খনিজ ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ পাওয়া যায়— পিপুলকুঠির এক দোকান হইতে আমরাও দুই-একটা ঔষধ কিনিয়াছিলাম। এ ছাড়া চামর, কম্বল প্রভৃতি আরো নানা জিনিস এই অনন্ত রত্নপ্রভব হিমালয়-প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নন্দপ্রয়াগে অলকানন্দা ও নন্দগঙ্গার সংগম হইয়াছে। স্থান অনেকটা সমতল হওয়াতে এই প্রয়াগে ভীষণ স্রোতোবেগ নাই। ইচ্ছামতো নামিয়া স্নান তর্পণ করা গেল।

প্রয়াগঘাটের নিকটেই তীরদেশে মহাদেবের মন্দির আছে, সেখানে দর্শনাদি করিয়া বাজারের মধ্যে নন্দ, যশোদা প্রভৃতির এক মন্দির দেখিলাম। নন্দপ্রয়াগেই নাকি কণ্বমুনির আশ্রম ছিল। তবে এই আশ্রম শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বের আশ্রম বলিয়া বোধ হইল না। কেননা, সেই "সৈকতলীনহংসমিথুনা" মালিনী এখানে কোথায়?

নন্দপ্রয়াগ হইতেই নিদাঘ-সূর্যের খরতর কিরণ পুনরায় অনুভূত হইতে লাগিল। আমরা আহারাদি করিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রৌদ্রের তেজ কিঞ্চিৎ কমিতে আরম্ভ করিলে চটি হইতে নির্গত হইলাম। আরো ৮ মাইল গিয়া জয়কুণ্ডি চটিতে রাত্রিযাপন করিলাম। পথে প্রায় দুই-দুই মাইল অন্তরেই ছোট ছোট চটি পাইয়াছিলাম।

অষ্টাবিংশ দিবস, সোমবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ

কর্ণপ্রয়াগ ও আদিবদরি

জয়কুণ্ডি হইতে কর্ণপ্রয়াগ প্রায় সাড়ে চারি মাইল হইবে। কর্ণপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত পিণ্ডরগঙ্গা (ওরফে কর্ণগঙ্গা) সংগত হইয়াছে। এই স্থানেও স্রোতোবেগ কম, আমরা স্বচ্ছন্দে নামিয়া স্নান-তর্পণাদি করিলাম। মহারাজ কর্ণ এখানে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রভূত সুবর্ণাদি দান করিয়া নামটি চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। এখানে ঘাটের পাণ্ডারা অন্নদান করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। ঘাটের উপরে মহাদেবের মন্দির এবং ইহারও একটু উপরে উমা-দেবীর এক প্রাচীন মন্দির।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা পিণ্ডরগঙ্গার উপরের পুল পার হইয়া কর্ণপ্রয়াগের বাজার পাইলাম। এখানে আমাদের যাত্রার সহায় গোমস্তাজি আমাদের কাছ হইতে বিদায় লইয়া রুদ্রপ্রয়াগের পথে অর্থাৎ তাঁহার বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা অপর দিকের সড়কে মৈলচৌরী অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। কর্ণপ্রয়াগে একটি পোস্ট অফিস আছে।

এখান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ প্রায় ২০ মাইল— বদরি হরিদ্বারের ওই পথটুকু মাত্র আমাদের দেখিবার বাকি থাকিল— যদিও ইহাতে দর্শনের তেমন কিছু নাই।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে মৈলচৌরী পর্যন্ত (২৯ মাইল) যে-সড়কটি গিয়াছে, ইহা ভালো রাস্তা— মাইল-স্টোন নিয়মমতো প্রোথিত আছে। আমরা ৪ মাইল গিয়া সিমুলি চটিতে আহারাদি করিলাম। এই চটির সন্নিকটে ঈশানকোণে পিণ্ডরগঙ্গার পারে একটি দেবালয় আছে— এখানে চণ্ডিকা আছেন— মহাদেবাদিও আছেন। চণ্ডিকার নিকটে ছাগাদি বলি হইয়া থাকে।

এখানে হইতে চলিয়া মধ্যপথে ভাটোলি চটি অতিক্রম পূর্বক সায়াহ্নে আদি-বদরি (বা আদ্-বদরি) পৌঁছিলাম। এই সকল চটিতে বদরির ফেরত যাত্রীরা মাত্র আইসে, সেই জন্য বিশেষ ভিড় হয় না। আদি-বদরির মন্দির পথেরই কিনারায় এবং চটির সংলগ্ন। তথাপি অনেক যাত্রী মন্দিরে গিয়া দেবতার দর্শন করিতে চায় না— বোধ হয়, উহাদের অর্থাভাবই ইহার কারণ। নচেৎ যে আদি-বদরি পঞ্চ বদরির অন্যতম বলিয়াই সাধারণত খ্যাত, তাঁহার দর্শনকল্পে এত বিমুখতা হইবার কোনো কারণ নাই। আমরা

সন্ধ্যার পর গিয়া বদরির আরতি দর্শন করিলাম। আদি-বদরি কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১১ মাইল।

ঊনত্রিংশ দিবস, মঙ্গলবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ

মৈলচৌড়ী

এই দিন অমাবস্যা— তাই প্রাতঃকালে চটির সমীপথ নারায়ণগঙ্গায় স্নানাদি করিয়া পুনশ্চ আদি-বদরির দর্শন করিলাম। এই মূর্তি বদরিনাথের মূর্তির ন্যায় নহে। মূর্তি বড় এবং হস্তে যথাক্রমে গদাপদ্ম-শঙ্খ-চক্র (উপরের ডান হাত হইতে উপরের বাম হাত পর্যন্ত) রহিয়াছে। শঙ্খ-চক্রাদির সংস্থানের বিভিন্নতায় নারায়ণের নানা সংজ্ঞা হয়— তাহা অনুসন্ধিৎসুগণ জানিতে পারেন। বদরির মন্দিরের পাশে আরো অনেক দেবমন্দির আছে। কিন্তু সকলগুলিরই আকৃতি ছোট। এক লিঙ্গরূপী মহাদেব আছেন— তাঁহার নাম "আদি কেদার"। জানকী, হনুমান, গরুড়, অন্নপূর্ণা ও মহিষমর্দিনীকেও দর্শন করিয়া, আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, চটি হইতে প্রাট ৭টার সময় বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে দুই-তিনটি চটি অতিক্রম করিয়া আমরা ১১টার সময় ৮ মাইল গিয়া সিমকোটি চটিতে আহারাদি করিয়া সাড়ে তিনটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। মৈলচৌরী রামগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে গাড়োয়াল জিলা শেষ হইয়া আলমোড়া জিলা আরম্ভ হইল। কান্ডি, ঝাপান প্রভৃতি গাড়োয়ালের কোনো কিছু আলমোড়ায় যাইতে পারে না— এই এক মহা অসুবিধাকর প্রথা। আমরা এখানে কান্ডিওয়ালাকে বিদায় দিলাম। রাত্রিতে দুই জন লোক জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য সাড়ে চারি টাকায় নিযুক্ত করিলাম। এখানে আরোহণার্থ এবং জিনিসপত্র বহন করিবার জন্য ঘোড়া পাওয়া যায়। কিন্তু দরদস্তুর করিয়া ভাড়া ঠিক করিতে হয়, তথাপি সাধারণত চড়িবার ঘোড়া ১০ টাকায় এবং মোট বহনের ঘোড়া বা মানুষ ৫ টাকায় (মণ-করা) এখান হইতে রামনগর পর্যন্ত (৬৮ মাইল) নিতে পারা যায়। এখানে ঝাপান মিলে, কিন্তু কান্ডি— অন্তত মোট-বহনার্থ— মিলে না বলিয়াই যেন বোধ হয়।

ত্রিংশ দিবস, বুধবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ

নূতন পথ ও বৃদ্ধ কেদার

ভোরে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সারিয়া রওয়ানা হইলাম। প্রথম এক মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিয়া তৎপর কতকটা উৎরাই চলিয়া বেশ সমান রাস্তা পাওয়া গেল। আট মাইল গিয়া চৌখুটি নামক স্থানে রামনগরের নূতন রাস্তা ধরিতে হইল।

পূর্বে চৌখুটি হইতে যাত্রীরা কাঠগোদাম যাইত, এখন রামনগর পর্যন্ত রেল আসাতে লোকে রামনগরই গিয়া থাকে। চৌখুটি হইতেও আমরা বেশ এক শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি দিয়াই চলিলাম। একজন স্থানীয় লোক আমাদিগকে বলিল যে, এ-স্থলেই বিরাট রাজার রাজ্য ছিল— এই মাঠে তাঁহার গরু চরিত, নিকটেই কীচকবধের স্থান। দ্বৈতবন ও কাম্যবন ইহারই নিকটে ছিল। পর্বতের উপর চারি মাইল আন্দাজ দূরবর্তী স্থানে একটি পুষ্করিণী আছে, সেই স্থান হইতে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল, ইত্যাদি।

আমরা এক মাইল গিয়াই ভাতকোট চটি পাইলাম। তৎপর দুই মাইল অন্তর চিনোনি চটি ছাড়িয়া এক মাইল গিয়া ভাগোটি চটিতে মধ্যাহ্নকৃত সম্পাদন করিলাম।

এ-স্থান হইতে চলিয়া এক মাইল অন্তর তেহার চটি পাইলাম। এটি বেশ ভালো স্থান। আরো এক মাইল গিয়া সানিশাল চটিতে একটি মন্দিরে মহাদেব সন্দর্শন করিয়া একটি বাঁধানো জলাধারের উৎকৃষ্ট শীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিলাম। এই পথে এই প্রকার জলাধার আরো দুই-একটি দেখিয়াছি, এইগুলির তলদেশের সহিত প্রস্রবণের যোগ আছে বলিয়া বোধ হইল।

তারপর মাইল খানিক গিয়া মাসি চটি পাওয়া গেল। এইটি বেশ বড় চটি। তৎপর ৪ মাইল চলিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বুড়া কেদারের স্থানে পৌঁছিলাম।

আমরা যে দুইটি লোক নিযুক্ত করিয়াছিলাম, ইহাদের একটি ব্রাহ্মণ, অপরটি ছত্রি। উভয়েই নিতান্ত অকর্মণ্য— সামান্য ১৮-১৯ সের মাত্র বোঝা নিয়াও চলিতে পারিল না। অথচ ইহাদের দুই জনের বোঝা এক জন গাড়োয়ালি কান্ডিওয়ালা অনায়াসে লইয়া যাইত। ইহাদের নিমিত্ত আমাদিগকে এই স্থানেই রাত্রিযাপন করিতে হইল।

সন্ধ্যার সময় রামগঙ্গা হাঁটিয়া পার হইয়া চটির অপর-পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ কেদারের মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। এ-স্থানের ব্রাহ্মণদের অবস্থা বড় ভালো নয়। আলমোড়ার রাজা রুদ্রসেন নাকি আন্দাজ চারি শত বৎসর পূর্বে বৃদ্ধ কেদারের নামে কিছু ভূসম্পত্তি তাম্রশাসন দ্বারা দান করেন— উহাই এখন সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জীবিকা। নূতন পথে যাত্রীরা এখানে আসে বটে, কিন্তু কেদারের দর্শনার্থ নদীর অপরপার্শ্বে অতি কম যাত্রীই গিয়া থাকে।

বৃদ্ধ কেদার একটি গোল দীর্ঘ প্রস্তর। ভূপতিত অবস্থায় বিরাজমান। দৈর্ঘ্যে ৬-৭ হাত এবং বেড় ৩-৪ হাত হইবে। মন্দিরে পার্বতীও আছেন। আমরা সান্ধ্য আরতি দেখিয়া রামগঙ্গা পুনরায় পার হইয়া একটি ভগ্ন দোতলা ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করিলাম।

একত্রিংশ দিবস, বৃহস্পতিবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ

গো-শকটের পথে

ভোরে উঠিয়া ৪ মাইল চলিয়া নালা এবং তৎপর সাড়ে তিন মাইল চলিয়া বিকিয়াসের চটি পাইলাম। এ-স্থানে একটি ক্ষুদ্র নদী পদব্রজে পার হইয়া এক প্রকাণ্ড পর্বতে উঠিলাম। সেই হইতে চড়াই উঠিতে উঠিতে ২ মাইল পরে শিরকোট চটি এবং তৎপর ৩ মাইল চলিয়া বাসোট চটিতে পৌঁছিলাম। এইটিই আমাদের শেষ চড়াই। পথে জলাভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বাসোট চটিতে আমরা মধ্যাহ্নকৃত্য করিলাম। কিন্তু এখানকার জল পরিমাণে অতি সামান্য এবং তেমন ভালোও নয়।

এখান হইতে গরুর গাড়ি করিয়া রামনগর যাওয়া যায়, অনেক যাত্রী তাহাই করিল। আর দেড় দিনের জন্য গোশকটে চড়িয়া পুণ্যের মাত্রা কমাইতে আমাদের প্রবৃত্তি হইল না, যদিও আমি অর্শের ভাব ছাড়া ডাইন পায়ের কড়ি আঙুলে ফোসকাজনিত একটা ঘায়েও কষ্ট পাইতেছিলাম এবং পা-টা কতক ফুলিয়াও গিয়াছিল।

আমরা এই চটি হইতে বহির্গত হইয়া দুই মাইল পর সিম চটি, তৎপর এক মাইল অন্তর গোয়ালখানা হইয়া তথা হইতে ৩ মাইল চলিয়া গুজরঘাটিতে উপস্থিত হইলাম। এইখানে গাড়ির উপর 'টোল' আদায় হয়।

আমরা এই স্থানে আসিয়া রানিখেত ও রামনগরের অত্যুৎকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছিলাম। রানিখেত এই স্থান হইতে ২৩ মাইল এবং রামনগর ৩৩ মাইল।

এখান হইতে কাপড়নলি আড়াই মাইল এবং তথা হইতে দেওলখণ্ড আড়াই মাইল। দেওলখণ্ডে আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

দ্বাত্রিংশ দিবস, শুক্রবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ

রামনগর

এই আমাদের হিমালয়-ভ্রমণের শেষ দিন। সড়কও ভালো, বেশ উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। দুই মাইল চলিয়া গডি চটিতে পৌঁছিলাম। এ-স্থান হইতে গাড়ির সড়কে টোটা-আম চটিতে যাইতে হইলে ৬ মাইল লাগে। কিন্তু একটি ফাঁড়ি রাস্তা আছে, তাহাতে দেড় মাইল মাত্র উৎরাই পথ চলিয়া সেই চটিতে আমরা পৌঁছিলাম। আবার টোটা-আম চটি হইতে কুমেরিয়া চটি গাড়ির সড়কে যাইতে হইলে ৬ মাইল লাগে। টোটা-আম হইতে অতি অল্প দূর গিয়াই বামদিকে একটি ফাঁড়ি পথ নামিয়া গিয়াছে। এই স্থানে গডির ফাঁড়ির ন্যায় কোনো সাইনবোর্ড নাই, অথচ খুব তলাইয়া না-দেকিলে রাস্তাটি সহসা দেখা যায় না। প্রকৃতই আমরা ওই পথটি ছাড়িয়া প্রায় আধ মাইলের উপর চলিয়া গিয়াছিলাম। যাহা হউক, পশ্চাৎ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া আমি ফাঁড়ির জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া ফাঁড়িতে প্রায় ২ মাইল চলিয়া কুমেরিয়া চটি পাইলাম। ডাক্তারবাবু আর ফিরিলেন না। তিনি সড়কের পথেই চলিয়া আমার প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে কুমেরিয়া আসিলেন।

কুমেরিয়াতে কুশী নদী হাঁটিয়া পার হইতে হইয়াছিল। কাঁচা পুলটি ভাঙিয়া গিয়াছিল।

কুমেরিয়া হইতে একটা রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর দিয়া প্রায় ৫ মাইল চলিয়া চৌফলা চটিতে পৌঁছিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করা গেল। চৌফলার নিকট দিয়া কুশী নদী প্রবাহিত, ওই নদীর গর্ভে চরের মধ্যে একটি ভগ্নাগ্র মন্দিরাকার টিলার উপর দেবতাস্থান-সূচক নিশানাদি দেখিলাম। শুনিলাম দেবতার নাম উপরদেবী। এখানে প্রায় সর্বদাই পাঁঠা প্রভৃতি বলি হইয়া থাকে। যাহারা এ-স্থান দিয়া বাণিজ্যার্থ উপরে যায়, তাহারা বলি সহকারে পূজা দিয়া যায়। বর্ষাকালে চারিদিক জলাকীর্ণ হইলে তখন পূজাদি হয় না। একজন ব্রাহ্মণ এখানে ফরেস্ট গার্ডের কাজ করেন, তিনিই পূজার কাজ চালাইয়া থাকেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়া স্থানটি দেখিয়া আসিলাম। লোহার শিকল ধরিয়া টিলায় চড়িতে হয়।

এ-স্থান হইতে চলিয়া কিয়দ্দূর গিয়া পাকা পুলে কুশী পুনশ্চ পার হইয়া গরজিয়া চটিতে পৌঁছিলাম। কুমেরিয়া হইতে গরজিয়া ছয় মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে যখন কুশী পার হওয়া অসম্ভব, তখন কুমেরিয়ার অপর পার হইতে আরেকটি পথে ১১ মাইল ঘুরিয়া গরজিয়ায় গাড়ি প্রভৃতি যায়।

গরজিয়া হইয়া রামনগর ৭ মাইল। আমরা সন্ধ্যার অল্প পূর্বে রামনগর পৌঁছিলাম। স্টেশনে লোকারণ্য দেখিয়া তথা হইতে ফিরিয়া বাজারে রাত্রির জন্য একটি দোতলা ঘরের উপরতলা ভাড়া করিয়া তথায় অবস্থান করিলাম।

উপসংহার

রামনগর হইতে প্রাতে ৬টায় এবং তৎপর ১১টায় গাড়ি মোরাদাবাদ যায়। আমরা পরদিন শনিবার ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া কুশীর তীরস্থিত একটি দেবালয়ে নারায়ণ ও মহাদেব দর্শনান্তে তাড়াতাড়ি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ৬টার গাড়িতে মোরাদাবাদ রওয়ানা হইলাম। সেই স্থানে প্রায় ১১টায় পৌঁছিয়া বারাণসীর গাড়িতে চড়িলাম। ডাক্তারবাবু পালামৌ জংশন স্টেশনে সন্ধ্যার সময় অবতরণ করিলেন— উদ্দেশ্য নূতন রেলপথে নিমখার গিয়া নৈমিষারণ্য দর্শন। আমার শরীরের অবস্থা বড় ভালো ছিল না, তাই আমি বরাবর রেলে চলিয়া পরদিন রবিবার প্রাতে বারাণসী আসিয়া বিশ্বেশ্বরের চরণপ্রান্তে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। ❑

—সমাপ্ত—

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (৫.১০.১৮৬৮-৩০.১০.১৯৩৮) রচিত 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ' সচিত্র গ্রন্থের (প্রকাশক: আশুতেষে ধর, আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫০/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা, মুদ্রক : শরচ্চন্দ্র সরকার, শিশুপ্রেম, ৬৫/১ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা, প্রকাশকাল : ১৩২১ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২) অন্তর্ভুক্ত 'বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ'-এর তৃতীয়াংশ (পৃষ্ঠা ৫৪-৮২) মুদ্রিত হলো।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী প্রসূন বর্মন, সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি।

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হতো। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

আজকের আমেরিকা

(দ্বিতীয় ভাগ)

রামনাথ বিশ্বাস

চিকাগোর পথে

আজও আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলে তৃপ্তি অনুভব করি। গর্বও করে থাকি। আমাদের গর্ব, আমাদের তৃপ্তি এসবের পেছনে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগোর লেকচার। সেই চিকাগো দেখবার একটা প্রবল বাসনা পূর্বেও ছিল, তারপর যখন ডিট্রয় এলাম তখনও সেই ভাবটা আবার ফিরে এল। ডিট্রয় থেকে চিকাগোর দিকে সাইকেলে যাবার আর চেষ্টা করলাম না। এরূপ চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। হাতে টাকা রয়েছে অথচ রাত্রে হোটেলে কেবিনে কোথাও থাকতে পাব না, এর চেয়ে কষ্টের আর কী আছেঙ্গ তাই চিকাগো যাবার অন্য বন্দোবস্ত হতে লাগল। বৃদ্ধ জগৎবন্ধু দেব মহাশয় আমার চিকাগো যাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে কংগ্রেস স্ট্রিটের গ্রিকদের হোটেলে এবং অন্যান্য স্থানে সুখাদ্য খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম।

মিঃ নাগের কয়েকজন তুরুক ও গ্রিক বন্ধু ছিল। তারা আমার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে ভালোবাসত। তুর্কিয়া আমি বেড়িয়ে এসেছি, তুরকাই ভাষায় কয়েকটি কথাও আমি বলতে পারতাম। এসব নানা কারণে এদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা বেশ জমত। গ্রিক ভদ্রলোক ব্যাবসা করতেন আর তুরুক ভদ্রলোক নানা বিষয়ে গবেষণা করতেন। যারা নানা বিষয়ে গবেষণা করে তারা প্রায়ই আনমনা হয়ে থাকে। কথা প্রসঙ্গে একদিন গ্রিক ভদ্রলোককে জিগ্‌গেস করেছিলাম কেন তিনি অনেক সময়ই নানারূপ ভুল করে বসেন? আমার কথার জবাব দিতে তিনি মোটেই পছন্দ করছিলেন না, অনেক বলার পর তিনি আমাকে তুরুক জাতের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। সেই কথাগুলি রাষ্ট্রনীতি নিয়েই জড়িত। রাষ্ট্রনীতি সকল সময়ই কূটনীতির অধীন। এ-সম্বন্ধে যারা বেশি বকে তারাই পথের লোক, কাজের লোক এ-সম্বন্ধে নীরব থাকতে বাধ্য হন। তাই তুরুক ভদ্রলোক নীরব থাকতেই ভালোবাসতেন। এইটুকু বলার পরই ভদ্রলোক মুখ খুললেন এবং বলতে লাগলেন, "আপনি সাইকেলে করে চিকাগোর দিকে যাবেন। পথে কোথাও কোনো কেবিনে হোটেলে আপনার স্থান হবে না।" তাঁর মুখ থেকে একটি অপ্রত্যাশিত কথা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ায় কথা বেশ ভালোই লেগেছিল। চিকাগোর দিকে মোটরে করে যাব এ-কথা বলায় তিনি সুখী হলেন না। তিনি বললেন, সবচেয়ে ভালো হবে যদি আমি গ্রেহাউন্ড বাস কোম্পানির বাসে করে চিকাগো যাই। কথাটা আর না-বাড়িয়ে এখানেই এ-বিষয়ের শেষ করলাম। আমি বেশ ভালো করেই বুঝেছিলাম এই ভদ্রলোকের আমেরিকা সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা আছে।

ডিট্রয় থেকে রওনা হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মিঃ মোহিত নামক এক ভদ্রলোক আমাকে তাঁর মোটর কারে করে চিকাগো নিয়ে যাবেন। যদিও মিঃ মোহিত মামুলি মজুরই, তবুও তাঁর ছোট্ট একখানা মোটর কার ছিল। তাঁর মোটর কারের দাম হবে আমাদের দেশের পঁচাত্তর টাকা। আমেরিকায় আমাদের দেশের তিনশো টাকায় বেশ ভালো মোটরকার কিনতে পারা যায়।

ডিট্রয় থেকে চিকাগোর পথে এসে আমার চিন্তা হলো পথে অনেকগুলি কেবিনে এবং হোটেলে থাকতে হবে। আমি অথবা মোহিতবাবু যদি হোটেল ম্যানেজারদের কাছে রুম ভাড়া নিতে যাই তবে কোনো মতেই আমরা রুম ভাড়া পাব না। হরিদাস মজুমদার ফর্সা লোক, তিনি সে-কাজ করতে সমর্থ

হবেন। তাঁকে সেই কাজের ভার দেওয়ায় তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু প্রথম দিনই একজন কেবিন-ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে ফিরে এলেন। তাঁকে অপমান করায় আমরা ঠিক করলাম, পথে কোথাও কোনো হোটেলে থাকব না, পথেই রাত কাটাব।

এক দিন এক রাত আমরা ছোট মোটরকারে কোনোমতে কাটিয়ে পরের দিন আর কষ্ট সহ্য করতে পারলাম না। একটা স্ট্রিটের এক পাশে মোটর দাঁড় করিয়ে তারই কাছে মাটিতে বসে পরের দিন রাতটা কাটিয়ে দিলাম। একেই বলে কোনোমতে রাত কাটানো। আমরা কোনোমতে রাত কাটাতে অভ্যস্ত। আমাদের সাহিত্যিক, আমাদের কবি অনেক পর্যটনকারীকেই কোনোমতে রাত কাটাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। এদেশে সেটি শোভা পায়, কিন্তু আমি যে-দেশের কথা বলছি তা হলো আমেরিকা। সেখানে মানুষ কোনোমতে রাত কাটাতে ভালোবাসে না এবং কোনোমতে রাত কাটায়ও না। অনেক সময় শোনা যায় অনেক যুবক অর্থাভাবে হোটেলে না-শুতে পেয়ে রোগগ্রস্ত হয়েছে, এবং অনেকে মরেছেও, সেজন্য আজ আমেরিকার যুবক বেপরোয়া হয়ে হোটলে অনধিকার প্রবেশও করে এবং রাতও ভালোভাবে কাটিয়ে পরের দিন বহাল তবিয়তে পথে বের হয়। আইন এবং আইনের রক্ষক পুলিশও বেশি কথা বলতে সাহস করে না।

আমরা ক্রমাগতই চলছিলাম। কোনোদিন পথের পাশে আর কোনোদিন-বা স্ট্রিটের মোড়ে রাত কাটিয়ে যখন হয়রান হয়ে উঠলাম তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে মোহিতবাবু বলেছিলেন, এমন সুন্দর দেশে থাকতে হলে এটুকু সহ্য করতে হয়ই। মোহিতবাবুর কথা আমার আর সহ্য হলো না, আমি মোহিতবাবুকে বলেছিলাম, "কায়স্থ হাজার শিক্ষিত হলেও ব্রাহ্মণের সেবা করেই চলে। আমার জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণকুলে, তাই এসব কষ্ট আমি সহ্য করতে সক্ষম নই। দয়া করে কোনোমতে আমাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে দিন, আমি স্বদেশের দিকে ফিরতে পারলেই বাঁচি।" ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলাম বলেই বর্ণবৈষম্য ভালো করে বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি সেই পাপ বর্ণবৈষম্যকে যেমন করে ঘৃণা করি, ভারতের অন্তস্তলের কালোদাগ জাতিভেদকেও তেমনই ঘৃণা করি।

কয়েকদিন ক্রমাগত অতি কষ্টে কাটিয়ে যখন আমরা চিকাগোর কাছে এলাম তখন রাত দুটো হয়েছিল। চিকাগোতে যথাস্থানে পৌঁছতে আরো তিন ঘণ্টা কেটে গেল। চিকাগোর লোক ঘুমিয়ে আছে অথবা জেগে আছে তা বোঝবার শক্তি নেই, কারণ তখনও লোক পথেঘাটে দিনের বেলার মতোই চলছিল। আমরা নিগ্রোদের বাসস্থান ছেড়ে এমন একটি স্ট্রিটে এলাম যার একদিকে নিগ্রোদের বাসস্থানের শেষ এবং শ্বেতকায়দের বাসস্থানের শুরু হয়েছে। রাতের বেলায়ই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই স্থানটিতে লোকের মনের ভাব কত নিকৃষ্ট হয়ে গেছে। পরে এসে সেই ভাবটি কতদূর নীচ স্তরে নেমেছে তা বুঝতে পেরেছিলাম। মানুষ মানুষকে কী রকমে ঘৃণা করতে পারে তা এখানে এলেই বোঝা যায়।

শ্বেতকায়দের ওয়াই-এর দরজা তখনও খোলাই ছিল। শ্রীযুত ঘোষ এবং হরিদাস আমাকে একটি ওয়াই-এর রুম ভাড়া করে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁরা বলে গিয়েছিলেন পরের দিন বিকেলে চারটের সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

আমি যে-রুমটি ভাড়া করেছিলাম তা ছিল ১৩ তলায়। তেরো সংখ্যা আমেরিকাতে অপয়া সংখ্যা বলে সকলেই এটিকে এড়িয়ে চলতে চায়। আমার কাছে তেরো নম্বরের কোনো মাহাত্ম্য ছিল না। তাই বিনা দ্বিধায় ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র রেখে ভাবলাম, আগে একটু স্নান করি, তারপর সকালের আহার সেরে নিয়ে সকাল বেলার সংবাদপত্র পাঠ করে একটু ঘুমোই।

স্নানের বেশ ভালো বন্দোবস্তই ছিল। স্নানাগারের দিকে যাবার সময় একদল লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাদের ভাবগতি দেখে মনে হলো, আমার ওয়াই.এম.সি.এ.-তে থাকাটা যেন মস্ত অপরাধ হয়ে গেছে। কোনো রকমে চোখ বুজে স্নান করে চলে এলাম। পরে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেই গরম 'হট কেক' আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলাম। কিন্তু কিছুই যেন আসতে চায় না। অগত্যা বয়কে ডেকে বললাম, "আমাকে নিগ্রো ভাববেন না, আমি একজন হিন্দু, আপনার জাত যাবে না।" লোকটি অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে কী ভাবল, তারপর খাবার এনে দিল।

আহারের পর তিনখানা সংবাদপত্র কিনে ওয়াই.এম.সি.এ.-তে ফেরবার পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পাশ কাটিয়ে পথ ধরে চলেছি, হঠাৎ যেন মনে হলো লোকটি আমার পিছন নিয়েছে। তাড়াতাড়ি লিফটের কাছে এসে উপরে চলে গেলাম, লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে এল। লিফটে সে একটা কথাও আমাদের সঙ্গে বলল না। ঘরের কাছে গিয়ে লোকটি বলল,

"এই ঘরের নম্বরটা অপয়া, তাই এ-ঘরে কেউ একা থাকতে সাহস করে না।" তার কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলাম। ভিতর থেকে কান পেতে শুনতে পেলাম, লোকটি অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলে চলে গেল। আমেরিকার পুঁজিবাদীদের উসকানিতে অনেক দেশের কুৎসা রটিয়ে অনেক বই রচিত হয়েছে, তার পরিচয় আমরা বেশ পেয়েছি। কিন্তু ওয়াই.এম.সি.এ.-তে এসে দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্নীতির যে-চরম দৃষ্টান্ত দেখেছি, আমাদের দেশের লোক বোধহয় তা ধারণাই করতে পারবে না।

একটার সময় ঘুম থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ঠিক করলাম, স্বামী বিবেকানন্দ যেখানে দাঁড়িয়ে বেদান্ত দর্শনের কথা বলে আমেরিকার নরনারীকে মোহিত করেছিলেন সেই স্থানটি দেখতে হবে। ওয়াই.এম.সি.এ.-র প্রচার বিভাগের সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেই স্থানটির সন্ধান চেয়েছিলাম। আমার প্রশ্ন শুনে সেক্রেটারি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, "এটা কি ঐতিহাসিক গৃহ? এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

প্রচার বিভাগের লোকটির কথা শুনে একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বললাম, "ভারতের এতবড় একজন দার্শনিক, যাঁর নাম পৃথিবীর লোকের মুখে মুখে সদাসর্বদা উচ্চারিত হয়, সেই বিবেকানন্দের কোনো খোঁজখবর আপনারা রাখেন না, সেটা সত্যিই দুঃখের বিষয়।"

"আজকাল ক-জন খ্রিষ্টান জিশু খ্রিষ্টের নাম নেয়, সে-সংবাদ রাখেন কি?"

"আর কেউ না-নিক অন্তত আপনার নিচ্ছেন, এটুকু বিশ্বাস করি।"

"হ্যাঁ, মুসোলিনি হিটলার স্টালিন এখন হয়েছেন অবতার, অতএব জিশুর নাম হয়তো আমাদের ভুলতেই হবে।"

কথা না-বাড়িয়ে ফিরে চলে এলাম। নিজের ঘরে ফেরবার সময় ভাবলাম হয়তো আমরা স্বদেশে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যা শুনি তা অনেকটাই প্রপাগান্ডা। স্নান করে ভালো করে পোশাক পরে খেতে বার হলাম। উপযাচক হয়ে দু-একজনের সঙ্গে ভারতীয় ধর্ম এবং খ্রিষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। আমার কথা কেউ শুনতে চায় না। সবাই যেন হিটলার আর মুসোলিনির খবরের জন্য উদ্‌গ্রীব, এ-ছাড়া তাদের কোনো চিন্তাই ছিল না। সুতরাং তর্কবিতর্কের মধ্যে না-গিয়ে পথের মানুষ পথেই বেরিয়ে পড়লাম। চলেছি শ্বেতকায়দের পাড়া দিয়ে। আমার মতো কলো লোককে নির্ভীকভাবে বেড়াতে দেখে অনেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচদের মতো মুখভঙ্গি করতে লাগল। তাদের মনের ও মুখের এরকম পরিবর্তন দেখে বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিলাম। আটচল্লিশ-এর মোড়ে যাবার পর অনেকগুলি নিগ্রোকে দেখে মনের অবস্থা অনেকটা সুস্থ হলো। এখান থেকেই নিগ্রোদের পাড়া শুরু হয়েছে।

কাছেই একখানা সংবাদপত্রের স্টল। সেখানে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে সংবাদপত্র বিক্রি করছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল ডিমক্র্যাসি বিপদে পড়েছে। আমার সেদিনের সংবাদ বেশ ভালোভাবেই জানা ছিল। তাই ছেলেটির কাছে গিয়ে বললাম, "ইউরোপীয় ডিমক্র্যাসি বিপদে পড়ছে বললে ভালো হতো।" ছেলেটি আমার কথা কিছুই বুঝল না। দোকানি এসে জিগ্‌গেস করল আমি কী বলেছি। তাকে বললাম, "ডিমক্র্যাসির অর্থ ব্যাপক, অতএব কথাটাকে ছোট করে বলাই ভালো। কারণ ব্রাউন এবং কালো লোক ডিমক্র্যাসির কোনো ধার ধারে না। পোল এবং জার্মান লড়াই করছে, তাতে আমাদের কী? নিগ্রোরা সাদা পাড়ায় হাঁটতে পায় না, সাদা হোটেলে থাকতে পায় না, অতএব পোল অথবা জার্মান জাহান্নামে গেলে নিগ্রোর কিছু আসে যায় না।" দোকানি আমার কথা শুনে একটু ভাবল, তারপর বলল, "আপনি সত্য কথাই বলছেন, নিগ্রো নিগ্রোই থাকবে।"

আমেরিকাতে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—"Italians are builders, Irish are rulers and Jews are owners." দোকানি জাতে জু— বিনয়ী, ব্যবসায়ী এবং স্বল্পভাষী। কিন্তু সে নূতন ধরনের ইহুদি। লিথোনিয়া থেকে এসে আমেরিকাতে বসবাস আরম্ভ করেছে। লিথোনিয়ার ইহুদিরা সব সময়েই সোভিয়েত নিয়ম পছন্দ করে আসছে, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল, যদি তাদের দেশ জার্মানরা দখল করে বসে তাহলে তাদের অবস্থা ভালো না-হয়ে খারাপই হবে। এদিকে লিথোনিয়া যদি রাশিয়ার সঙ্গে মিলে যায় তাহলে মাতৃভূমি ছেড়ে তাদের পরের দুয়ারে ঘুরে বেড়াতে হবে না এবং ভবিষ্যতের আর্থিক দুরবস্থা আর বর্তমানের সামাজিক দুর্গতির কথা ভাবতে হবে না। সেজন্যই দোকানি আমাকে কোনোরকম বাধা না-দিয়ে আমার কথায় সায় দিয়েছিল। আমি-যে হিন্দু সে-কথা তার কাছে না-বলে তাকে আমার কথার সমর্থন করার জন্য ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছি, এমন সময় সে একখানা 'মস্কো নিউজ' আমার হাতে

দিয়ে বলল, "যদি ডিমক্র্যাসি জানতে হয় তাহলে এই পত্রিকাখানা পড়ুন, দাম একটি নিকেল মাত্র।" এক নিকেল দিয়ে 'মস্কো নিউজ' কিনে পার্কে গিয়ে তাই পাঠ করতে লাগলাম।

আমেরিকাতে ডিমক্র্যাসির প্রবল প্রতাপ। ডিমক্র্যাট পার্টির প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। বক্তৃতা দেবার স্বাধীনতা সে-দেশে আছে, সংবাদপত্র পাঠ করতে কোনো বাধা নেই। আমি জানতাম না পার্কে বসে 'মস্কো নিউজ' পাঠ করতে গেলেই গুপ্ত পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। মন দিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকাটা পাঠ করছিলাম, আর ভাবছিলাম যে ভাষাটা বেশ সুন্দর অথচ তাতে ভাবপ্রবণতা মোটেই নেই। মঁশিয়ে বরদিতা হলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। তাঁর নাম অনেকদিন অনেক স্থানেই শুনেছি। আজ হঠাৎ তাঁর কথা বিশেষ করে মনে হলো। মনে হলো তাঁর চীনের কার্যাবলি। তিনিই নাকি একদিন বলেছিলেন যদি মাও এখনই কাজ শুরু করেন তাহলে চীনের সমূহ ক্ষতি হবে। রুশ বিপ্লবীরা কথা অতি অল্পই বলেন, কী করে তাঁর মুখ থেকে এরকম কথা বের হয়েছিল, তাই আমি ভাবছিলাম।

কাছেই একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর ফিটফাট সাজগোজ, চেহারার জৌলুস, বসবার কায়দা, এসব দেখেই মনে হয়েছিল তিনি একজন বড় লোক। আমার কাগজ পড়ার ভঙ্গি দেখেই বোধ হয় তিনি কাছে এগিয়ে এস মস্কো নিউজের বাইরের পাতাটার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে একেবারে সটান কাছে এসে বললেন, 'বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, কাগজটা একটু দেখতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

"এটা কোথাকার সংবাদপত্র?"

"আপনাদের দেশেরই, তবে এসেছে রাশিয়া থেকে।"

"আপনার দেশ কোথায়?"

"হিন্দুস্থানে।"

"এসব সংবাদপত্র আপনাদের দেশে যায় না?"

"জানি না।"

"এখানে কবে এসেছেন?"

"গত রাত্রে।"

"কোথায় থাকেন?"

"ওয়াই.এম.সি.এ.-তে।"

"ওয়াই.এম.সি.এ.-র ঘরের চাবি আপনার কাছে আছে?"

"আছে বই-কি।"

"দেখাতে পারেন?"

"দেখাব না।"

"তবে দুঃখিত, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।"

"তা-ই হোক, চলুন কোথায় যাবেন। আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

ভদ্রলোক একখানা ব্যাজ দেখালেন, বুঝলাম তিনি গোয়েন্দা। পকেটে ছোট একটা পিস্তলও রয়েছে। তাঁকে জিগ্‌গেস করলাম, "খবরের কাগজ পড়ার অপরাধেই গ্রেপ্তার করা হলো বুঝি?"

"তা নয়, আপনার হাতে মস্কো নিউজ।"

"কোথায় আমার হাতে। এ যে আপনারই হাতে দেখছি। চলুন কোথায় যাবেন।"

গোয়েন্দা একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ আমারই হাতে, তবে এই পার্কে বসে এসব সাহিত্য পাঠের স্বাধীনতা যে নেই, সে-কথা বোধ হয় আপনি জানতেন না। এখন জানিয়ে দিলাম, সুতরাং এইটাকে পকেটে পুরুন।" গোয়েন্দা পার্কের বাইরে এসে আমায় বললেন, "গুডবাই।" আমি বললাম, "একেই বলে আপনাদের দেশের ডিমক্র্যাসি।"

গোয়েন্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকানির কাছে এসে গোয়েন্দার কথা বললাম। দোকানি বলল, "সেজন্যই দেখছেন না, কাগজটা একরকম চুরি করেই বিক্রি করেছি। এদিকে লিথোনিয়ার যত স্টল আছে, সব ক'টাতেই 'মস্কো নিউজ' পাবেন, আমেরিকানরা এসবের ধার ধারে না। এদের রাতারাতি কোটিপতি হবার যেরকম হুজুগ তেমন হুজুক আর কারো নেই। সেজন্যই এরা এত বিপদে পড়েছে।"

"বিপদ বলে তো কিছুই দেখছি না?"

"আগে এরা কথায় কথায় মিলিয়ন ডলারের কথা বলত, এখন এক গ্রান্ট (একশো) ডলারকেই বড় মনে করে। এই শহরেই দেখবেন নিকেল, ডায়েম (পাঁচ সেন্ট, দশ সেন্ট) নিয়েও লোকে সুখী হয়। এখন আর আগের আমেরিকা নেই। সোনার খড়ি উজাড় হয়েছে, পেট্রোলের মাইন ধনীদের হাতে চলে গেছে, রিয়াল এস্টেট অনেক হয়েছে, মজুরি কমেছে, অথচ খরচ আগের মতোই রয়েছে। বেকার সমস্যাও কম নয়, কাজ পেলেই লোক যেন বাঁচল। ঘড়িতে চেয়ে দেখি তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। বাসে করে ওয়াই.এম.সি.এ.-তে এসে দেখলাম, মোহিতবাবু তখনও আসেননি। রিডিং রুমে 'মস্কো নিউজ'টা ফেলে দিয়ে একটা চেয়ারে চুপ করে বসে দরজার দিকে চেয়ে

রইলাম।

কতক্ষণ পর একজন পাঠক মস্কো নিউজটা হাতে উঠিয়েই ধপ করে তা টেবিলে ফেলে দিলেন, যেন সাপের গায়ে হাত দিয়েছেন। ভাবলাম এ-হেন পদার্থ এখানে আনা উচিত হয়নি। তৎক্ষণাৎ মস্কো নিউজটা নিজের হাতে নিয়ে পাঠ করতে লাগলাম। যে-ভদ্রলোক নামটা দেখেই আঁতকে উঠেছিলেন তিনি জিগ্‌গেস করলেন, "এটা কি আপনার?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কি কমিউনিস্ট মত পোষণ করেন?"

"এখনও ঠিক করিনি।"

"এসব কাগজ পাঠ করবেন না, ভগবানে ভক্তি থাকে না।"

"আমাদের দেশে চার্বাক বলে একজন দার্শনিক ছিলেন, তিনি ভগবান বলে কিছু মানতেন না।"

"সেরকম দার্শনিকের কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, রুশরা ডিমক্র্যাট নয়, তারা ডিক্টেটরের নির্দেশ মতো চলে।"

"আপনারা?"

"আমাদের দেশে ডিমক্র্যাসি পূর্ণমাত্রায় আছে।"

"সেজন্যই নিগ্রোরা পথে বার হলে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, বুভুক্ষুর দল ইম্পিরিয়াল ভ্যালিতে মরছে। ডিমক্র্যাসি বলতে আপনি কি তা-ই বোঝেন?"

ওয়াই.এম.সি.এ.-র বৈঠকখানায় পাঁচশো লোক বসে আরাম করে কথা বলতে পারে। আমাদের কথায় সময় অন্ততপক্ষে শতাধিক লোক সেখানে ছিল, তারা সবাই আমার কথা শোনবার জন্য কাছে এসে পড়ল। নানা লোক নানা প্রশ্ন তুললেন, তার যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলাম। মোহিত ঘোষ এসে দেখলেন আমি বেশ আলাপ জমিয়ে তুলেছি। যা হোক, তাঁর সঙ্গে বাইরে আসতে হলো। তিনি জিগ্‌গেস করলেন—

"এরা আপনার কথা বুঝতে পারে?"

"পারে বলে তো মনে হয়।"

"এতদিন আমেরিকায় থেকেও আমরা আমেরিকানদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাইনি।"

ইউ ইয়র্ক, লন্ডন এবং অন্যান্য স্থানে দেখেছি, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক সাদা লোকের সঙ্গে মেশবার সাহস রাখেন না, অথচ আমাদের দেশের যারা খালাসি, তারা ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে একবার মিশতে পারলে শ্বেতকায়দের তাদের মতোই ভাবে এবং সমানে সমানে ব্যবহারও করে এবং পেয়েও থাকে।

দু-বছর আগে আমাদের দেশের কয়েকজন খালাসি ডারবান গিয়েছিল। তারা চায়ের দোকানে চা খেতে গিয়ে যখন দেখল যে চা দেওয়া হচ্ছে না, তখনই তারা চায়ের দোকান ভাঙতে লাগল, দোকানিকে প্রহার দিল এবং অনেক টাকার লোকসান করল। বিচারে তাদের কোনো শাস্তি হলো না, কারণ তারা বুঝিয়ে দিল যে তাদের অপমান করা হয়েছে। তখন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার রেস্তোরাঁতে লেখা থাকে 'ওনলি ফর ইউরোপিয়ান'।

চিকাগোর এক নিগ্রো পাড়ায় আমার থাকার স্থান ঠিক হলো। যে-ব্লকে আমি থাকতাম, সেখানে আমরা কয়েকজন ছাড়া সকলেই আমেরিকান শ্বেতকায়। আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি একজন হিন্দু। তাঁর পূর্বপুরুষ আখের চাষ করবার মজুর হয়ে প্রথম ত্রিনিদাদে যান— তাঁরই বংশধর শিক্ষায় ও চালচলনে নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই শ্বেতকায়দের ব্লকে স্থান পেয়েছেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হিন্দু পরিবারের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। কারণ এরাও নিগ্রোদের ঘৃণা করে। তাদের এই নিগ্রো-বিদ্বেষ যাতে বেশি দেখতে না-হয়, সেজন্যে বাইরে বাইরেই সময় কাটাতে লাগলাম। দুপুরে একটার সময় ঘুম থেকে উঠে বের হতাম, রাত চারটের আগে ফিরে আসতাম না। সমস্ত শহরটাকে একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছে হলো। এই শহর খুন ও ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত। এখানে চোর আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মিউজিয়াম আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কসাইখানা আছে। এই শহরের বিশেষত্ব হলো, এখানে অনেক বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক থাকেন। বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকরা এই নগরকেই তাঁদের প্রধান আস্তানা করে নিয়েছেন, তার একটা কারণ আছে। সাধারণত যাঁরা সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাঁরা নির্জনতাপ্রিয় এবং দারিদ্র্য তাঁদের চিরসঙ্গী। কিন্তু এই নগরে অনেক গলিঘুঁজি আছে, যেখানে শস্তায় থাকা যায়। সেজন্যই দরিদ্র বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের এখানে এসে থাকতে হয়। এদেশে সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে পেশা করেন না, সাহিত্য তাঁদের সাধনার বস্তু। এই দরিদ্র সাহিত্যিকদের পাড়ায় একদিন গিয়েছিলাম।

বেলা তখন তিনটে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। এক দিকের ফুটপাথের ছায়ায় বসে একদল ছেলে জুয়ো খেলছিল। তাদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন তাদের জুয়ো খেলা দেখতে

আমি ভয়ানক ইচ্ছুক। তাদের একজনকে ডেকে জিগ্‌গেস করলাম, এখানকার যিনি সবচেয়ে বড় লেখক, তিনি কোথায় আছেন বলতে পার?

ছেলেটি বলল, "নিশ্চয়ই, তবে তিনি আজ সকালেই লস এঞ্জেলেস চলে গেছেন, ফিরতে এক সপ্তাহ দেরি।"

আর কোনো লেখক কাছাকাছি কোথাও আছেন কি না জিগ্‌গেস করায় ছেলেটি আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে বলল, "এই বাড়িতে অনেক লেখক আছেন, যাঁদের পেশাই হলো বই লেখা।" বাড়িটাকে লক্ষ করে এগিয়ে চললাম।

দোতলা বাড়ি। নীচের তলায় বৈঠকখানা। বাইরে থেকেই কাচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল অনেকগুলি লোক বসে বই পড়ছে। ভিতরে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে জিগ্‌গেস করলাম, "এখানে আপনারা কি সকলেই লেখক?"

একজন বললেন, "হ্যাঁ, আপনার জন্যে কিছু লিখতে হবে কি?" কথাটা শুনেই আমার রাগ হলো, কিন্তু সবিনয়ে বললাম, "লেখকদের দর্শন পেতেই এসেছি, কিছু লেখাতে নয়।" আমার কথা শুনে প্রথমে সকলেই হেসে উঠল। আমার পরিচয় দেবার পর কেউ আর বিশ্বাস করল না যে আমি একজন হিন্দু। একজনকে জিগ্‌গেস করলাম, "আমার জাত সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ এখনও দূর হয়নি বলে মনে হচ্ছে।"

একজন প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন যে আমি নিগ্রো ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না। আমি সেই লোকটিকে লক্ষ করে বললাম, "হই-না আমি নিগ্রো, তবুও আমাকে পরিব্রাজক বলে আপনাদের বিশ্বাস করতে হবেই।"

জায়গাটি আমার ভালো লাগল। সকলেই আমাকে অনুরোধ করলেন কিছু বলার জন্যে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিলাম। সর্বপ্রথমেই বললাম যে যারা নিজেদের লেখক বলে পরিচয় দেয়, অথচ একজনের মুখ দেখে বুঝতে পারে না লোকটি কোন্ দেশের এবং কোন্ জাতের, সেই লেখকরা করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। উপসংহারে বলতে বাধ্য হলাম, যাদের মধ্যে নিগ্রো-বিদ্বেষ রয়েছে তারা কী করে লেখক হতে পারে, তাও বিবেচ্য বিষয়। লেখকগণ আমার কথা শুনে আমাকে অপমান করতে প্রবৃত্ত হননি। তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, হয়তো তাঁদের লেখার কিছু খোরাক আমি জুগিয়েছিলাম। লেখকগণ যে-দেশেরই লোক হোন-না কেন, অন্তত নূতন কিছু জানবার আগ্রহ তাঁদের থাকেই। কথাটা মনে রেখেই এত কথা বলতে সাহস করেছিলাম।

চিকাগো আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম নগর। অন্ততপক্ষে তিনমাস যদি থাকতাম, তাহলে অনেক কিছুই জানতে পারতাম আর অনেক কথাই বলতেও পারতাম। কিন্তু সে-সুযোগ আমার হয়ে ওঠেনি। যে-কয়দিন ছিলাম, বুঝতে চেয়েছিলাম, চিকাগোতে এত দস্যুবৃত্তি হয় কেন। এই সাহসিকদের সম্বন্ধে এখানে অনেক কাহিনি শোনা যায়। অনেকে বলেন, যারা অলস, তারাই এসব দুরন্ত কাজ করে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে ঠিক তা নয়।

এব্রাহাম লিংকন প্রচারিত 'কাজ করো, ভিক্ষা কোরো না' নীতিতে কাজের ফল ভোগ করে পুঁজিবাদী এবং মজুরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা সামান্য কিছু দিয়ে থাকে মাত্র। যারা লিংকন-এর মত মানে না, কাজকে সোসিয়ালাইজ করতে চায়, তারাই কাজ ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদীদের ধনরত্ন অপহরণ করে জীবন কাটায়। কথাটা শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু কার্যত তা নয় বলেই মনে হলো। বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি, যাঁরা আমেরিকা থেকে ফিরে গিয়ে গ্যাংস্টারদের কথা নিয়ে রোমাঞ্চকর গল্প রচনা করেন, তাঁদের কথার কোনো মূল্যই নেই। এসব গল্প সিনেমার জন্যেই লেখা এবং সিনেমাতেই তা শোভা পায়। পূর্বে চিকাগোর বেশ বদনাম ছিল, কিন্তু বর্তমানে চিকাগোর ডাকাত চিকাগো ছেড়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ চিকাগোতে এখন ভিখারির আড্ডা হয়েছে। আমেরিকানরা বলে, যেখানে পোলান্ডের লোক আর ইহুদি বাস করে, সেখানে টাকা থাকতে পারে না। পোলরা শস্তায় কাজ করে, আর ইহুদিরা টাকা জমায়। চিকাগোতে সিনেমা, সিগারেট, ঘরভাড়া, প্রভিশন অন্য যে-কোনো শহরের চেয়ে শস্তা, কারণ এখানে লোকের কেনবার ক্ষমতা কমে গেছে।

চিকাগো থেকে বিদায় নেবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম কারণ নগরের সকলেই যেন আলাদিনের প্রদীপ খুঁজে বেড়াচ্ছে রাতারাতি বড়লোক হবার জন্যে। চিকাগো সম্বন্ধে আমার একটা বেশ ভালো ধারণা ছিল, কিন্তু দেখবার পর আমার সে-ধারণা চুরমার হয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড নগর, বুভুক্ষু রাক্ষসী যেন হাঁ করে আছে। চিকাগো থেকে বিদায় নেবার আগে একটি ছোট গলিতে মিঃ মোহিতের সঙ্গে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে মনে হলো, যা শোনা যায় তেমন কিছুই নয়।

চিকাগো শহর ছেড়ে আসার পর আমরা পথে তেমন কোনো বড় শহর পাইনি। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে এসেই আমরা দেখতে পেয়েছি, Private Hotel, Travellers' Hotel এবং ক্যাবিন কিন্তু সল্ট লেক সিটি না-পৌঁছনো পর্যন্ত আমরা শান্তি পাইনি। পথিকের জন্য এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোনো সুবিধা হলো না, যেহেতু আমাদের রং সাদা নয়। প্রত্যেকটি হোটেল, ইন্, ক্যাবিন যেন আমাদের বলছে 'এসো না'। হয়তো আমি একা থাকলে কোনো কষ্টই হতো না, কারণ আমার সঙ্গী সদাসর্বদা সাদা লোকই জোটাত। কিন্তু এ যে সোনায় সোহাগা, তিনজনই হিন্দু এবং তিনজনই একরঙা। একজনের অপমানে তিনজনকেই কষ্ট পেতে হচ্ছে। অপমান নীরবে সহ্য করা আমাদের উচিত কিন্তু নিজের পরিচিত লোকের সামনে তা অসহ্য।

ক্রমাগত মোটর চালিয়ে আমরা সল্ট লেক সিটিতে এসে বিশ্রাম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সেই বিশ্রামের তুলনা হয় না। একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও যেন ঘুমের শেষ হয়নি। ঘুম থেকে উঠে অপমানের কথা ভুলে গিয়ে মরুভূমির উপর হলিউডের স্টুড়িয়ো দেখতে গিয়েছিলাম। স্টুডিয়ো দেখবার জন্যে বেশ লোক সমাগম হয়ে থাকে। স্টুডিয়োগুলিতে মরুভূমির চিত্র ওঠাবার বন্দোবস্ত যা আছে, তা প্রচুর নয় বলেই মনে হলো— তবে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে মরুভূমির ছবি তোলবার আরো ভালো বন্দোবস্ত আছে।

সল্ট লেকের পাশ দিয়ে বেশ সুন্দর পিচ দেওয়া পথ চলে গেছে। পথের পাশেই স্বচ্ছ জল, সে-জলের স্বাদ বড়ই তিক্ত। যে-কোনো লোক গিয়ে সেখানে সাঁতার কাটতে পারে। জলে ডুবে যাবার ভয় মোটেই নেই। রাবণ হ্রদের জলে মানুষ ডোবে না শুনেছিলাম, কিন্তু তা দেখবার সুযোগ হয়নি। সল্ট লেক দেখে বুঝলাম, বাস্তবিকই জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ রয়েছে, সেখানে লোক জলে ডুবে নীচে যেতে পারে না। আমি তিরিশ হাত জলের নীচ থেকে ডুব দিয়ে মাটি ওঠাতে পারি, কিন্তু এই হ্রদের জলে তিন হাত নীচে গেলেই দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো হয়েছিল।

হ্রদের তীরে কোথাও একফুট, কোথাও অর্ধফুট উঁচু হয়ে লবণ পড়ে আছে। কিন্তু আমেরিকার লোক এখনও তত গরিব হয়নি যে এখান থেকে লবণ উঠিয়ে সেই লবণের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হবে।

অনেকক্ষণ হ্রদে এবং হ্রদের তীরে অবস্থিত স্টুডিয়োগুলোতে ভ্রমণ করে আমরা সামনের পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হলাম। রকি এবং আন্ডিজ পর্বতমালার নাম পৃথিবীতে সুপরিচিত। আমরা এই পর্বতমালার উপর দিয়ে চললাম।

আমেরিকাতে রকি এবং আন্ডিজ পর্বতমালা দেখবার জন্য সবাই ব্যগ্র। এই পর্বতমালার ঢালুতে অবস্থিত হলিউড, এল এঞ্জেলেস, সানফ্রানসিস্কো, সিয়াটেল প্রভৃতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। তারা যখন ক্যালিফোর্নিয়া দেখতে আসে তখন তাদের মস্ত বড় একটা পর্বত পার হতে হয়, সেই পর্বতই হলো রকি। আমি ও মোহিতবাবু সেই পর্বতের উপর দিয়ে মোটরে করে চলছিলাম।

মোটর কারে বসেও কত উঁচুতে চলেছি তা বোঝা যায় যদি একটি যন্ত্র থাকে। সেই যন্ত্রটি ছোট একটি ঘড়ির মতোই তবে তা আমাদের কাছে ছিল না, তাই মনে হচ্ছিল মামুলি পাহাড়ি পথেই চলেছি। অনেক স্থানে আবার সমতল ভূমি। সেই সমতল ভূমিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তা দেখলে মন অপ্রসন্ন হয়। দেখতে মোটেই ইচ্ছা করে না। এরকম সমতল ভূমি অনেকক্ষণ চলে আবার আমরা একটু পাহাড়ি স্থানে এলাম। পাহাড়ের দু-পাশে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রামগুলিকে ক্যাম্প বললেও চলে। লোকসংখ্যা কত তা গ্রামের বাইরে মস্ত একটা সাইনবোর্ডে লেখা থাকে। গ্রামে যদি দুজন লোকও এসে রাত্রে থাকে তাহলে বলা হয় গ্রামের লোকসংখ্যা বাড়ল অথবা যদি কোনো লোক গ্রাম থেকে অন্যত্র যায় তাহলে বলা হয় গ্রামের লোকসংখ্যা কমল। প্রিমিটিভ ধরনে সেই গ্রামগুলি তৈরি করা হয়েছে। এমন-কি যাকে আমরা কেবিন বলি তাও এর চেয়ে ভালো বললে দোষ হয় না।

আমরা একটি গ্রামে এলাম। গ্রামের লোকসংখ্যা দুজন। আশা করেছিলাম এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে একটু কথা বলব কিন্তু গ্রামের দুই জন বাসিন্দার কেউই তখন গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না, সেজন্য আমাদের শূন্য গ্রামেই বেড়াতে হয়েছিল। আমি বলেছি গ্রাম আদিম যুগের প্রথা অনুযায়ী প্রস্তুত। তার মানে এমন কিছু নয় যা নিয়ে আমরা বেশ হাসতে পারি। গ্রামে চারটি বাড়ি। দুটি বাড়ি তিন তলা আর একটি দোতলা, অন্যটি একতলা। প্রত্যেকটি বাড়ি কাঠের তৈরি। কাঠগুলি অর্ডার দিয়ে কেনা হয়নি। কাঠগুলি হয় পথ থেকে কুড়িয়ে আনা হয়েছে নয়তো কোনো কেবিন ভেঙে পড়েছিল যা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ঘরের অনেক স্থানে বেনজিনের টিন

কেটেও লাগানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঘরগুলি দেখলেই মনে হয় কোনো ভবঘুরের দল কোনো এক সময়ে এখানে আড্ডা গেড়েছিল, তাদের পরিত্যক্ত জিনিস দিয়ে ঘর ক-খানা তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় ঘরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দশস্কোয়ার ফুটের বেশি নয়। প্রত্যেকটি তলা আবার সাত ফুটের বেশি নয়। ঘরগুলি একই লাইনে অবস্থিত এবং চারটে ঘরের লোক যারা এসে বাস করেন তাঁদের জলের কোনো ব্যবস্থা দেখলাম না। প্রত্যেকটি ঘরের পেছনে স্তূপাকার পুরনো টায়ার টিউব। এবং দুধ, মাছ, মাংস, মাখন এসবের খালি টিন পড়ে ছিল। আমেরিকার নগরে, শহরে এবং গ্রামে কেউ টিনের দুধ ব্যবহার করে না। কাগজের একরকম বোতল হয় তাতেই দই, দুধ, ঘোল বিক্রি হয়ে থাকে। দুধের টিন দেখেই মনে হলো, অনেক দূর থেকে যারা আসে এবং নানা অসুবিধায় পড়ে তারাই এই গ্রামে থাকতে বাধ্য হয়। এরকম গ্রাম বাস্তবিকই আনন্দদায়ক। চারদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ, লোকজন নেই, জল নিশ্চয়ই কোথাও আছে নইলে কেউ এসে এখানে থাকতে পারত না যদি বলি তাহলে ভুল হবে, কারণ এদিকে যে-ই আসে তারই সঙ্গে কিছু জল থাকেই। গ্রামের কাছে জল না-থাকলেও যে বৈজ্ঞানিক যুগে গ্রামে মানুষ থাকতে পারে না তা নয়। তবে আমি জানতাম রকি পর্বতের উপর দিয়েও আমরা চলেছি। জল নিকটে কোথাও আছেই। আমরা গ্রাম পরিদর্শন করে গাড়িতে এসে বসলাম আর আমি ভাবতে লাগলাম আমেরিকার সিনেমার কথা। অনেকগুলি সিনেমায় দেখেছি এরকম গ্রামের চিত্র এবং লোকসংখ্যা কমতি ও বাড়তির সংবাদ।

দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের সামনে আসছিল আর চলে যাচ্ছিল। তারপর আসছিল ক্যালিফোর্নিয়ার দৃশ্য। সে-দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা যেন একটা কচ্ছপের পিছে ধীরে উঠে হঠাৎ নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিলামঙ্গ কিন্তু তার আগে একটি ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা হলো, আমাদের একমাত্র ড্রাইভার মোহিতবাবুর ক্রমাগত ঘুম পাচ্ছিল আর হাত দুখানা অবশ হয়ে আসছিল। দু-রাত দু-দিন ক্রমাগত বেচারা মোটর চালিয়েছেন। মানুষের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। বুঝে নিন কালার বারের কত শক্তি। কোথাও রাত কাটাবার স্থান পাইনি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল স্বদেশের একটি ঘটনা। দেশের কথা বলতে মুখে বাধে। মুখে দেশের কথা আটকে যাবার দুটি কারণ। যাদের কথা বলতে যাচ্ছি তারা হয়তো অপমানিত হয়েছে বলে রাগ করবে, আর যাদের অন্যায় আচরণের কথা বলব তাদেরই স্বধর্মে আমি জন্মেছি। অতএব ভারতের অত্যাচারিত শ্রেণির লোক তোমাদের কথা তোমরাই বলো, আমি তোমাদের কথায় সায় দেব কিন্তু তোমরা যতদিন তোমাদের দুঃখের কথা না-বলছ ততদিন আমি মনে করব তোমাদের দুঃখ বলতে কিছুই নেই। মহাত্মাগণ অপরের দুঃখে দুঃখিত হন, কিন্তু তোমরা এমনই স্তরে রয়েছ যে, তোমাদের দুঃখের কথা যদি তোমাদের স্বদেশবাসী বলে তাহলে তোমরা অপমান বোধ কর। অতএব এক্ষেত্রে আমি নীরব থাকাই পছন্দ করি।

আমরা একটি সুন্দর স্থানে এসেছি। সেখানে একটি গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে তিনটি মাত্র স্ট্রিট। দুটি স্ট্রিট সমান্তরাল হয়ে এসে তৃতীয় স্ট্রিটে মিশেছে। গ্রামের স্ট্রিটে অ্যাসফল্ট অথবা সিমেন্ট করা নেই। গ্র্যাভেল দেওয়া পথের উপর ইট ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে খালি পায়েও হাঁটা যায়। গ্রামে একখানা ইহুদির হোটেল ছিল। ইহুদি বড়ই সাহসী। সে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট এবং কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট হলেই লোকগুলি একটু উগ্র, কর্মঠ এবং সাহসী হয়। সে আমাদের অনুরোধ এককথায় মেনে নিল। সে বলল, মানুষই, কালা ধলা বিচার্য নয়। মিঃ হরিদাস মজুমদার হলেন কমিউনিস্টদ্রোহী, তাঁর এই হেটেলে মন উঠছিল না, কিন্তু যারা তাঁরই মতো জাতীয়তাবাদী তারা তাঁকে তাদের হোটেলে স্থান দেয়নি, ভবিষ্যতেও দেবে না। তাঁর মতবাদ এখানে আমরা বজায় রাখতে পারলাম না। আমরা শুতে চাই। তাঁর বিনা অনুমতিতেই হোটেলে গিয়ে উঠলাম এবং রেস্তোরাঁতে খেতে গেলাম। রেস্তোরাঁর লোক খাদ্য বিক্রয় করল বটে কিন্তু একজন বয় বলল, "এরা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নইলে কমিউনিস্ট হোটেলে যাবে কেন?" মিঃ হরিদাস সে-কথার প্রতিবাদ করলেন এবং বেশ উচ্চ স্বরেই বললেন তিনি ন্যাশনালিস্ট। আমি বললাম, "যারা কালার বার মানে না, শ্বেতকায় হয়ে অশ্বেতকায়দের রুম ভাড়া দেয় তারা বাস্তবিকই সৎলোক এবং নমস্য। আমি আমেরিকার কমিউনিস্টদের নমস্কার করছি।" মিঃ মজুমদার আমার প্রতি বেশ একটা কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। আমি তাঁকে ইংলিশেই বললাম, "ভাগ্যে আজ আমরা কমিউনিস্টদের হোটেলে উঠেছিলাম, তাই রাতে শোব এটা একরকম নিশ্চিতই, কিন্তু মিঃ হরিদাস, গত দু-রাতের কথা ভাবুন। একটুও ঘুম হয়নি, পা ব্যথা করছে আর আমাদের বন্ধুর শরীর অবশ হতে চলেছে। আমেরিকার যারা ন্যাশনালিস্ট তারাই

আমাদের এই দুর্দশার কারণ, এতক্ষণ ঘুরে কোথাও স্থান পাননি সে-কথা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন? আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। কিছু খেয়ে নিন তারপর বিছানাতে গিয়ে শুতে হবে, বিছানা কী আরামের হবে, কেমন হাত-পা ছড়িয়ে আমরা শুতে পারব।" আমি যখন বিছানার কথা বলে লেকচার দিচ্ছিলাম তখন একজন আমেরিকান বললেন, "লোকটা কতই-না অত্যাচারিত হয়েছে তাই বিছানার কথায়ই মত্ত, কত পরিশ্রান্ত হলে লোক এমন করে একই কথা বার বার বলে?" আমাদের খাওয়া হয়ে গেলে আমরা বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

সকালবেলায় আমরা নব উদ্যমে পথে নামার আগে হোটেলওয়ালাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে আমি বললাম, বেঁচে থাকো, সুখী হও। হোটেলওয়ালা আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করে বলে উঠল, কালার বার ধ্বংস হোক। আমরাও তার কথার প্রতিধ্বনি করলাম। তারপর আমাদের ছোট মোটরকারও যেন কালার বার ধ্বংস হোক কথার প্রতিধ্বনি করে পথে বেরিয়ে পড়ল।

আমাদের দু-দিকে আঙুরের সুন্দর সাজানো বাগান। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আঙুরের বাগান অনেক দূরে চলে গেছে। আমাদের মোটরের তেলের নলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ এরই মধ্যে ঢালু শুরু হয়েছে।

দু-দিকের সুন্দর দৃশ্য কমেই অদৃশ্য হতে লাগল, তারপর এল আঁকাবাঁকা পথ। পথের দু-দিকে সুন্দর শহর। শহরের লোক সবাই তখন কাজে ব্যস্ত ছিল। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘরের ভেতরের দৃশ্য চোখে এসে পড়ছিল। আমেরিকার স্বাধীন রমণী যেমন স্বামীকে ধমকাতে পারে, কান ধরে ঘর থেকে বার করে দিতে পারে তেমনই স্বামীর সেবাও করতে পারে। স্ত্রী যদি শুধু ঘরের রানি হয় এবং স্বামীর অন্তরের রানি না-হয় তাহলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক হয় না। সেরকম সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে উভয় পক্ষেরই উভয় পক্ষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া দরকার। আমেরিকার স্বাধীন রমণীকে ঘর মুছতে, বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাপড় কাচতে এবং দরকার হলে পরিশ্রমের কাজও করতে হয়। তারপর যখন ধীরে নীচে নেমে আসছিলাম তখন দেখতে পেলাম, নীল সমুদ্র নীল আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। প্রাচ্যের প্রশান্ত সাগর দেখা যাচ্ছে। এ-কথা বলেই অনেক অবান্তর কথা টেনে আনতে পারতাম, কিন্তু আমার মত ও পথ পৃথক সেজন্য প্রশান্ত মহাসাগরের কথা বিশেষভাবে বললাম না, শুধু সেই দৃশ্যটি দেখে একটা আনন্দ মনে এসে দেখা দিয়েছিল। তারপর দেখলাম একটা প্রকাণ্ড সেতু। সেতুটি ট্রেজার আইল্যান্ডের উপর দিয়ে চলেছে ফ্রিস্কোর দিকে। আমরা যখন সেতুর উপর এসে একটু দাঁড়ালাম তখন বাস্তবিকই এক অপরূপ সৌন্দর্য দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। আমি ভাবছিলাম আজই আমার পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত হবে। বাস্তবিক সেইদিনই বিকেলবেলায় আমার পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত হয়েছিল।

মিঃ মোহিত ঘোষ আমাকে ক্লে স্ট্রিট-এর কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার আপনার হোটেল আপনি ঠিক করে নিন।" কম করে পনেরোটি হোটেল খোঁজাখুঁজির পরও কোথাও জায়গা পেলাম না। অগত্যা মিঃ মোহিত ঘোষের কাছেই ফিরব বলে স্থির করেছি, এমন সময় একজন লম্বা, ধবধপে সাদা যুবক আমাকে জিগ্‌গেস করলেন, "কী চাই আপনার?"

"হোটেলে থাকবার জায়গা, কিন্তু এদেশে যে আমাদের জায়গা পাওয়াই মুশকিল হয়ে উঠেছে।"

যুবকটি বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন, নাম স্টার ইন্টারন্যাশনাল হোটেল। সে হোটেলের মালিক একজন ফরাসি ভদ্রলোক। আমার দেশ ও জাতির পরিচয় না-জেনেই তিনি আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। মোহিতবাবুর কাছ থেকে আমার যথাসর্বস্ব পুঁটুলিটা এনে ঘরে রাখলাম। তারপর তাঁকে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। তিনি যাবেন সান্তিয়াগো।❑

—সমাপ্ত—

(রামনাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৫) রচিত 'আজকের আমেরিকা' গ্রন্থের (প্রকাশক পর্যটক) প্রকাশন ভবন, ১৫৬ আপার সার্কুলার রোড, এম-৬ কলকাতা, মুদ্রক ঃ প্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা, প্রকাশকাল, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৩৪৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১) অন্তর্ভুক্ত 'চিকাগোর পথে' (পৃষ্ঠা ১৬৯-১৯২) সংকলিত হলো।)

গতবছর (২০২২ সালে) ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রমানাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল অসমিয়া ও বাংলা ভাষার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে তাদের কবিতা এখানে প্রকাশ করা হলো :

অসমিয়া বিভাগ

জ্যোতির্ময় ওজা (প্রথম পুরস্কার)

ৰং

আকাশৰ বিশালতা, সাগৰৰ গভীৰতাৰ
মিলনৰ দিগন্তৰ বাৰু কি ৰং ?
কাচিয়ালি ৰ'দ আঘোণৰ সোণগুটিৰ
মিলনৰ পথাৰৰ বাৰু কি ৰং ?
দিনৰ কোলাহল, ৰাতিৰ নির্জনতাৰ
মিলনৰ ক্ষণৰ বাৰু কি ৰং ?
গ্রীষ্মৰ উষ্ণ, শীতৰ জঠৰতাৰ
মিলনৰ বসন্তৰ বাৰু কি ৰং ?

অতীতৰ বুকুত, বুৰঞ্জীৰ পাতত, ৰঙৰ প্রেমত
জন্ম হৈছিল কত শতু প্রেমিকৰ।
ভিঞ্চি, ৰফেল, ইঞ্জেলো
অথবা ভেন গ'ঘৰ।
মনালিছাৰ মনোমোহা হাঁহি, মেডোনা
ফুলিছিল সূর্যমুখী,
ৰঙৰ বুকুতেই সৃষ্টি নৱজাগৰণৰ।

সময়ৰ যুদ্ধত, পৰিৱর্তনৰ চক্রবেহুত,
ৰং লঙঠা হয়,
বগা উচ্চ, ক'লা নিচ
ৰঙৰ বিভাজন হয়।
গেৰুৱা হিন্দুৰ, সেউজীয়া মুছলমানৰ
মানুহৰ ৰং উকা হয়।
ৰঙৰ যুদ্ধ, সৃষ্টি সলনি ধ্বংস
সভ্য... ছিঃ কি বীভৎস,
বগা, ক'লা, গেৰুৱা, সেউজীয়া... আৰু কত কি
সকলো জহি-খহি পৰি ৰয়
সেউজ পৃথিৱীত ৰঙা ৰঙৰ নদী বয়।

সবিতা দাস (দ্বিতীয় পুরস্কার)

অ' গঙ্গা

বৰ দুঃখ লাগে তোমালৈ
অ' গঙ্গা।
জীৱন পান ধুই তুমি
শাঁত পোৱা নাছিলা
যুগে, যুগে
এতিয়া তুমি নিজৰ
বুকুত আঁকোৱালি ল'লা
অসংখ্য ম'ৰা শ
জীৱশ্রেষ্ঠ এতিয়া
নতশিৰ হৈ উচুপি আছে
পৰিত্যক্ত দেহাবোৰলৈ
ৰ' লাগি চাই আছে
বিজ্ঞান, ধর্ম, নাম, ধন-সম্পত্তি
সকলো লজ্জিত হ'ল
কালৰ গ্রাসত মিলিত হ'ল
সভ্য মানুহৰ চন্দ্রত অৱতৰণ কৰা
উপলব্ধি
নোৱাৰিলে আপোনজনক
নিৰাপদে ৰাখিবলৈ
মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিত সমর্পণ কৰি

আহিলে সকলো সম্পর্ক
বৰ দুঃখ লাগে অ' গঙ্গা
তুমি অৱশেষত
ম'ৰাবাহিনী হ'লা
আমি এতিয়াও তোমাৰ বুকুৰ
বোজাক আওকাণ কৰি
শাৰী পাতি আছোঁ
সঞ্জীৱনী বুটিলৈ
কিংবা অলপ কিবা খাবলৈ
পোৱাৰ আশাত এটা
একাকিত্ব কোঠাত
ভ্ৰমত জীয়াই আছোঁ সকলো
মহামাৰীৰ কবলত আমি
নপৰোঁ
কিন্তু ভয় লাগিছে জানা
তুমিও যদি উটুৱাই ভাগৰি যোৱা
আৰু বালিত আশ্ৰিত কৰি থোৱা
কোনো হিংস্ৰৰ ভোগাতুৰ উদৰৰ
তৃপ্তি হবলৈ।

আকাংক্ষা দত্ত (তৃতীয় পুৰস্কাৰ)

উৰুকা

অ' পিতাই,
সৰিয়হ তুলিছনে?
মৰণা চালিছনে তই,
বৰ কষ্ট হৈছে চাগৈ তোৰ!
ৰাতি ৰাতি হেঁচি ধৰা কাহটোৰে
জিলিকাই তুলিছে চাগৈ বুকুৰ কামিহাড়!!
গামোচাখন মেৰাই ল'বি
ঘুগুলাবোৰ বেয়া বৰ!!
এইবেলি বন্ধক খুলিম
মহাজনৰ ঋণ মোকলাম!
ভটিয়াই যোৱা সোঁতত উভতনি বঠা বাম।
আই অ'
এইবেলি ব'হাগত
ঘূণে ধৰা খুটাকেইটা আঁতৰাম
বালি-ইটাৰে বৰঘৰ সাজিম
চাৰিকড়ীয়াই চুব নোৱৰাকৈ!!
চালেৰে আৰু আকাশ নেদেখোঁ
দুদিন ৰবি,
পকনীয়াৰ নৌকাত বান্ধিম বালিচন্দাৰ ভেটা!!
ৰূপহী!
সৰু সূতাৰ গামোচাবোৰ কটিলিনে?
বিহুতে এখন দিবি ডিঙিত মেৰাম
সীমান্তত ঠাণ্ডা বৰ!
য'ত ৰুদ্ধ হৈ যায় স্পন্দন,
উশাহবোৰে সাজিব খোজে ৰাঙলী ইগলু!!

আমি বহুত দিনৰ মূৰত,
পুৰণি বিষটো উজাই আহিছে,
উৰলি পৰিছে ধৰাশায়ী সপোন,
ক্ষমা কৰিবি পিতাই,
বন্ধক খুলিব নোৱাৰিলোঁ মই
খণ্ডিত বঠাই বাট হেৰুৱালে;
দুখ নকৰিবি আই,
বাৰুদৰ ধোঁৱাত দিশহাৰা হ'ল আকাংক্ষার
পানচৈ!
পোনাক তোক গতালোঁ
শিকাবি অহিংসাৰে জগত জীয়াবলৈ!
ভুল নুবুজিবি ৰূপহী;
তোৰ ৰঙা সেন্দুৰৰ অপমৃত্যুত!
মই আৰু আহিব নেৱাৰিম ঘূৰি
চিনাকি নদীৰ অচিন ঘাটলৈ... !!

বাংলা বিভাগ

প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি (প্রথম পুরস্কার)

মুঠোফোন-অন্যমন

ব্যস্ততার পরিভাষা এখন মুঠোফোন, সিলিংয়ের নীচে সম্পর্ক আজ নীরব।
পরিমিত বাক্যে চলে কথোপকথন, এটাই হয়তো কঠিন বাস্তব।

জিগাবাইটে আবদ্ধ আজ প্রেম, ভালোবাসা,
ঠোঁটের কোনায় জমা স্মিতহাসি।
ইথারেই সব অনুভূতির যাওয়া আসা,
যতই না মোরা চলি পাশাপাশি।

খাবার ভুলে খবরের সন্ধান, বিনোদন আজ আনলিমিটেড।
একেই বলে আধুনিক বিজ্ঞান,
চোখ খুলে খোঁজা লেটেস্টে আপলোড।

শব্দবাক্যে ইমোজির ব্যবহার, প্রতিক্রিয়ার অভিনব মাধ্যম।
প্লে স্টোর ঘিরে অ্যাপসের সমাহার, হাতের মুঠোয় দুনিয়া ডট কম।

অচেনা সম্পর্ক গড়ে ওঠে অবসরে, কাছের মানুষ সরে যায় দূরে।
আত্মাবিহীন আত্মীয়তার ঘোরে, মুঠোফোন আজ সকলের মন জুড়ে।

তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

চির অম্লান রবি

উৎসবেরই আকাশ জুড়ে
মন্দ্র-মেঘের হাঁক,
আমার কাল-বোশেখে বসন্ত যে
পঁচিশে বৈশাখ।

চির নতুনের ছন্দে জাগে
আমার আশৈশব,
মুগ্ধবোধে সিক্ত তোমার
সৃষ্টিরই বৈভব।

কোথাও তুমি 'বুড়োঠাকুর'
ছেলের বাউল ঘুড়ি,
তোমার বুকে সাঁতরে খুঁজি
জীবন বাঁধার নুড়ি।

তোমার খোঁজে হাঁটছি যত
দেখছি ততই দূর,
অনুধ্যানের মন্ত্র তুমি
ওহে আঁখির নূর।

তোমার মুক্তি আলোয় আলোয়
এই আকাশে হয়,
আমার মুক্তি জরায়, খরায়
বাঁধনে নিশ্চয়।

দিন-দহনে রবীন্দ্রনাথ
মানুষ অসহায়,
'অমল' হয়ে মুক্তি খোঁজে
তোমার শব্দছায়।

যাপনকথায় মেশাও তুমি
বাঁচার নতুন সুর,
স্তব্ধ শোকের মালায় গাঁথো
আনন্দ রোদ্দুর।

সময়স্রোতে সন্ধ্যা নামুক
উঠুক ভীষণ ঝড়,
আঁধার ভেঙে স্বপ্ন আঁকার
তুমিই কারিগর।

ক্রান্তিকালের অস্ত-গাথায়
যতই ভাঙুক লয়,
অম্লান রবে রবীন্দ্রনাথ
বিবিক্ত অক্ষয়।

তৃষা পাল (তৃতীয় পুরস্কার)

কথোপকথন

আচ্ছা, তৃষা তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?
সহজ সরল উত্তর দেবে?
- "সহজ-সরল"টা খুব জোর দিয়ে বললে দেখছি?
আচ্ছা করো এইবার প্রশ্নটা ... depends
- তোমার পাহাড় পছন্দ না সমুদ্র?
- প্রশ্নটা কি এটাই ছিল?
- তুমি উত্তর দাও; বলছি...

- মমম..., পাহাড়, সমুদ্র দুটোই অনুভব যদিও খুব আলাদা,
তবুও আমি সমুদ্রের পাশে থাকতে বেশি ভালোবাসি
- কেন সমুদ্র কেন? পাহাড় কেন না?
- এইবার উত্তরটা 'সহজ-সরল' ভাবে হবে না যে... বলব?
উফ্... কথায় তোমাকে ফেলানো যায় না সত্যি...
আচ্ছা বলো...- সমুদ্রটা যেন ঠিক আমার মতন, অন্তহীন,
অপ্রয়াসিত
পারে বসে তুমি যতই চিৎকার করো, তোমার আওয়াজটা
যেমন অন্তহীনতায় মিশে যায়, ফিরে তাকানোর দাবি রাখে
না...
মনে হয় আমার প্রত্যেকটি দুঃখ কষ্ট যেন খুব নিম্ন... আমি
সাগরের পারে মুক্ত আকাশের নীচে হাজার বার নিজেকে
হারিয়ে ফেলেও, নিজেকে আবার খুঁজে পাওয়ার আশা রয়
না।
- আর পাহাড়?
- পাহাড়?

পাহাড় যেন খুব অভাবী,
প্রত্যেকটি শব্দের উত্তর চাই,
হারিয়ে যাওয়া মানুষের নামটি চিৎকার করে ডাকলেন
সেই নামটি যেন আবার আমার কাছে ফেরায়...
এক অদ্ভুত অপেক্ষা রয়েছে ওই পাহাড়ের বুকে,
অজস্র কান্নার আভাস রয়েছে ওই পাথরের বুকে,...

২০২২ সালে পুরস্কৃত দুই কবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপনের সংক্ষিপ্তসার :

সমীর তাঁতী - নমস্কার। আজকের দুজন পুরস্কার বিজয়ীকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমি প্রথমে অসমিয়া কবি শ্রদ্ধেয় আনিছ উজ জামানকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। সেই প্রশ্নটি এই ধরনের যে তাঁর নির্বাচিত কবিতার ভূমিকায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্যার একটি কথা বলেছিলেন যে, তিনি প্রতীকবাদী ধারার শেষ দিকের কবি। এই ধারার কবিতা সম্পর্কে কিছু কথা এবং এই ধারার কবিতা কি এখনও প্রচলিত আছে এবং যদি না-থাকে তাহলে কেন নেই এবং যদি প্রচলিত তাহলে এই ধারার কবিতা এখন কী পর্যায়ে আছে সে-সম্পর্কে আমি তাঁকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাই।

আনিছ উজ জামান - ধন্যবাদ সমীর, আমরা যখন কবিতা লেখার মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছিলাম সেই সময়টি ছিল সত্তরের দশক এবং সেই সময় প্রতীকবাদী কবিতা, চিত্রকল্পবাদী কবিতা সব জায়গা জুড়ে ছিল। কারণ সেই সময় মধ্য গগনে ছিলেন নীলমণি ফুকন, নির্মলপ্রভা বরদলৈ, হীরেন ভট্টাচার্য, ভবেন বরুয়া, নবকান্ত বরুয়া প্রমুখ কবি। সেই সময়টিতে তাঁরাই প্রতীকবাদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং আমরা পেছনে পেছনে তাঁদের অনুসরণ করতাম। তাঁদের আয়ত্ত করতে গিয়ে, তাঁদের কবিতায় নিজেকে বিলীন করতে গিয়ে আমরা সেই ধারাটিতে প্রবেশ করেছিলাম। কারণ আমরা অনুভব করেছিলাম যে, তাঁদের কবিতায় এমন কিছু আছে যার জন্য মানুষ তাঁদের মহান দৃষ্টিতে দেখছেন। অনুভব করেছিলাম যে, প্রতীকবাদী আন্দোলন যা বহিঃরাজ্যে প্রচলিত ছিল, তাঁরা এই আন্দোলনকে সজীবরূপে অসমে প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এটি অন্য কোনো রাজ্য থেকে আসেনি। সেই আন্দোলনটি সরাসরি ইউরোপ থেকে এসেছিল এবং অসমে সেই আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন নীলমণি ফুকন, ভবেন বরুয়া, হীরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি । সেই জন্যই সেই ধারাটিতে নিজেকে বিলীন করতে পেরে এই বলে আনন্দ লাভ করেছিলাম যে কিছু একটা করেছি। কবি সব সময় মনে করেন যে তিনি এমন কিছু করতে চান যা অন্য কেউ করেনি। তাই প্রত্যেক কবির কবিতার ছন্দ আলাদা আলাদা। নীলিম কুমার আজ যে কবিতাগুলো লিখেছেন সেগুলো অন্য কবিরা লেখেন না। কারণ প্রত্যেকের নিজস্ব ধারা আছে এবং এটি আমাদের অসমিয়া কবিতায় একটি স্থায়ী রূপ পেয়েছে। কারণ আমাদের অসমিয়া কবিদের মধ্যে কোনো ঈর্ষা নেই। অন্যদের আলোয় প্রতিভা সৃষ্টি হবে তা নয়, বরং তাঁরা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজস্ব প্রতিভাকে প্রকাশ করতে চান। কবিরা সবসময় একত্রিত হয়ে এগিয়ে চলুন, তা প্রত্যেকেই চান। ইউরোপীয় কবি লোরকাকে ১৯৩৭ সালে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার দশ বছর পর এদেশে অমূল্য বরাকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের কবিদের মধ্যে একটি শিরা থাকা প্রয়োজন এবং সেই শিরাটি যখন ছিঁড়ে যায় তখন কবিদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। সেজন্য আমি যে আজ বারবার লোকসাহিত্যের কথা বলছি, তার কারণ লোকসাহিত্য আমাদের এক সঞ্জীবিত রূপ দেয়, যা অভাবনীয়। তাঁর যাযাবর জীবনে সারা দিনব্যাপী তিনি যাযাবরি গানগুলি শুনে শুনে গিটারে তোলেন ও রাতে এসে গিটার বাজিয়ে বাজিয়ে কবিতা লেখেন তিনি বিশ্ব বিখ্যাত কবি। খুবই অকালেই তাঁকে আমরা হারালাম। কিন্তু তিনি বারবার বলেছিলেন যে কবিদের মধ্যে সবসময় একটি শিরা থাকা প্রয়োজন। আজ এখানে উপস্থিত আমরা প্রত্যেক কবিই বিশ্বাস করি যে কবিদের মধ্যে একটি শিরা থাকা প্রয়োজন। আমরা সেজন্য ছাড়তে পারি না জ্যোতি প্রসাদ আগরওয়ালাকে, ভুলতে পারি না চন্দ্রকুমারের সেই অজয় কবিতাটি বা আমরা ভুলতে পারব না নলিনীবালা দেবী প্রমুখ কবিদের। আমাদের ধারণা কিছুটা আলাদা হবে। কারণ আধুনিকতায় আমাদের চিন্তাধারা আলাদা রূপ নিয়েছে। সেজন্য আমরা হয়তো তাঁদের বাঁশিটা বাজাব কিন্তু সুরটা আমাদের নিজেদের হবে। আমি মনে করি আমাদের অসমিয়া কবিদের মধ্যে হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই এবং যারা হিংসা করে তারা ক্রমশ নিজেরাই হারিয়ে যায়।

বাঙালি কবিদেরও আমরা অধ্যয়ন করেছি। বাঙালি, অসমিয়া এই যে কথাটি, সে-সম্পর্কে আমি একবার বাংলাদেশে আমার এক বক্তৃতায় বলেছিলাম যে "জল কাটলে দুই ভাগ হয় কি? জল কাটলেও দুই ভাগ হয় না।" আমাদের বাঙালি ও অসমিয়ার মধ্যে সম্পর্কটি এমন আমরা একই জলের, আমাদের কেউ ভাগ করতে পারবে না। আজ হয়তো সেজন্যই বাঙালি একজন কবিকে সম্মান জানিয়েছেন, আমাদের অসমের একজন কবিকেও সম্মান জানিয়েছেন।

সমীর তাঁতী - আরও কিছু প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, আপনার সাম্প্রতিক সংগ্রহগুলির মধ্যে একটি হল নদীটি কোথায় যাচ্ছে। আপনিও জানেন না আমিও জানি না নদীটি কোথায় যাচ্ছে এবং নদীটি কিসের? আমরা যে নদী দেখি, না অন্য এক নদী এবং কোথায় যায় সে কথাটা সেও জানে না আপনিও জানেন না সে বিষয়ে যদি একটু বিস্তরিতভাবে বলেন। নদী কেথায় যাচ্ছে আপনিও জানেন না আমিও জানি না এই সম্পূর্ণ কবিতার একটি প্রভাব আছে। আমি গত ১৫-২০ বছর ধরে জাপানি কবিতা পড়ছি। আমার বইও জাপানি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। একটি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আরও একটি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আগে দশজন জাপানি কবির কবিতা বের হয়েছিল, এখন একজন কবির ২১০টি কবিতা বের হবে। এটি এপ্রিল বা মে মাসের শেষ দিকে বের হবে। সেখানে আমি অনুভব করেছি এই যে নদীটি যেই নদীটি জাপানে আছে, যে নদীটি চীনেও আছে, যে নদীটি আমাদের অসমে আছে সেই নদীটির সুর এবং গতিময়তা একই। কারণ জল সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। জাপানের নদীটির জল উলটো দিকে প্রবাহিত হয় না বা চীনের নদীও উলটো দিকে বয়ে চলে না। প্রতিটি দেশের নদী প্রতিটি দেশের ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে চলে। আমি যে নদীটি দেখেছি সেখানেও অনেক ইতিহাস আছে, সেখানে জীবন্ত ইতিহাস আছে, প্রেমের ইতিহাস আছে, কোথাও সংগীতের ইতিহাস আছে এবং সেই নদীটি আমি অর্ধেক দেখেছি অর্ধেক দেখিনি। যখন আমরা নদীটির কাছে যাই তখন রোমান্টিক ভাবনায় আচ্ছন্ন হই এবং এই ভাবনাটি মনে আসার জন্য কবিতাটি এভাবে লেখা হয়েছে। জাপানি কবিতাগুলো ছোট ছোট, কিন্তু এতো চমৎকার তার ধ্বনি ও গতিময়তা যা একেবারেই আলাদা। সেজন্য এটি অনুবাদ করে আমার এটি খুব ভালো লেগেছে। এখন প্রশ্ন হল, কবিতা এবং জীবন এই দুটি কথাকে আপনি আপনার জীবনে কীভাবে উপলব্ধি করেন— এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কিছু বলবেন?

আনিছ উজ জামান - কবিতা ও জীবন এই দুটি জিনিস একটি আরেকটিকে ছেড়ে চলতে পারবে না, কারণ জীবনকে নিয়েই কবিতা এবং কবিতাই হলো মানুষের জীবন। এখানে অনেক কবিই উপস্থিত রয়েছেন। তাঁদের জীবনের প্রতিধ্বনি সরাসরি কবিতায় বাজে, সেটি শব্দ হয়ে বাজে অথবা ছন্দ হয়ে বাজে। কারণ, কবিতা এমন হওয়া উচিত যে-কবিতায় সংগীত নেই সেই কবিতায় সৌন্দর্য থাকে না। কারণ জীবনের সৌন্দর্যটি প্রকাশ করতে কবিতাটি যে রূপ ধারণ করেছে সেটিই প্রধান কথা। আমরা বিভিন্ন রাজ্যের কবিতা পড়েছি। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ বা অন্যান্য রাজ্যের কবিতা পড়েছি। ওইসব কবিতার মধ্যে তাদের প্রত্যেকের জীবন রয়েছে। আসলে একজন লেখকের জীবনে তাঁর সৃষ্টির একটি সম্পর্ক থাকে। *থাকাঝি* শিবশঙ্কর পিল্লাই 'চেম্মিন' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তিনি সেই উপন্যাসটিতে জেলেদের জীবনকে যেভাবে তুলে ধরেছেন তা অনেক উপন্যাসেই নেই। কারণ জীবনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি উপন্যাসটি লিখেছেন। 'The old man and the sea', 'And Quite Flows the Don'-এ গ্রিগরি নামের একটি চরিত্র ছিল। সেই চরিত্রটি জীবনের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে ছিল সেগুলো পড়লে আমরা অনুভব করি। আমরা প্রত্যেক কবির মধ্যে সেই জীবনকে উপলব্ধি করি। সেজন্য মৃত্যু হলে আবার যেন এই গরিব দেশেই জন্ম নিই— নলিনীবালা দেবী এমনিই বলেননি। জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণেই আমরা লিখতে পেরেছি, আমরা অনুভব করতে পেরেছি, আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি এবং আমরা আনন্দ বোধ করতে পেরেছি।

সমীর তাঁতী - কবিতা হচ্ছে মানবজাতির মাতৃভাষা— একথাটি আপনি জানেন। এখানে আমি আপনাকে আরও একটি প্রশ্ন করতে চাই যে, আপনি মৌলিক কবিতার বাইরেও অনুবাদ কবিতা পড়েছেন বা নিজেও অনুবাদ করেছেন। জাপানি কবিতার অনুবাদ আপনি করেছেন। জাপানি কবিতার অনুবাদ ইতিমধ্যে অনেক কবিই করেছেন। বিশেষ করে নীলমণি ফুকনের জাপানি কবিতা, তারপর ড. বিপুলজ্যোতি শইকিয়ার জাপানি মত্যুবিষয়ক কবিতা বা সমীর তাঁতীর প্রেমের কবিতা। তারপরও আপনি জাপানি কবিতা অনুবাদ করেছেন। এই সকল অনুবাদকের তুলনায় আপনার অনুবাদ কী ধরনের বলে আপনি মনে করেন অথবা

জাপানি কবিতা অনুবাদ করে আপনার অনুভব কেমন বা আপনি কী উপলব্ধি করেছেন। জাপানি কবিতা সম্পর্কে আমাদের কিছু বললে ভালো হয়। জাপানি কবিতা তিন লাইনের কবিতা। পাঁচ সাত পাঁচ বলে একটি ফর্মে এই কবিতাগুলি রচনা করা হয় যাকে বলা হয় সাতটি শব্দের পাঁচটি শব্দ। কিন্তু আমি যে ইংরেজি কবিতাগুলোর জাপানি অনুবাদ দেখেছি সেখানে কিন্তু সেই ফর্মটি কেউ রাখতে পারেননি, যার ফলে কবিতাগুলো বিকৃত হয়ে যায়। ফুকন স্যর অসমিয়ায় অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং ফুকন স্যরের অনুবাদের মূল আদর্শ হচ্ছে তিনি নিজেই। আমরা একবার মাঙ্কু বাসুর কবিতা করেছিলাম। তিনি পা দুটো ক্রস করে প্রাণায়াম করছিলেন। তখন তাঁর গুরু ইজু এসে জিজ্ঞেস করলেন কী করছিস বাসুঙ্গ বললেন, আমি বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি। তখন তাঁর গুরু দুটো ইট নিয়ে ঘষতে শুরু করলেন, বাসু বললেন, গুরুজি আপনি এ কী করছেন? তখন গুরুজি বললেন আমি আয়না বানাতে চেষ্টা করছি। তখন বাসু বললেন, ইট ঘষে আয়না বানানো যায় না। গুরুজি বললেন পা দুটি ক্রশ করে বসলেই কি বুদ্ধ হওয়া যায়? তাই আমি ধ্যানের কথা বলছিলাম। ধ্যানই হচ্ছে মূল জিনিস এবং প্রত্যেক কবিকেই ধ্যানে মগ্ন হতে হয়।

সঞ্চালক - এবার আমি অতুন ভট্টাচার্যকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। অতুন ভট্টাচার্য কবি, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক। নেতাজিনগর কলেজে বাংলা সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করছি, তিনি কবি কালীকৃষ্ণ গুহকে কিছু প্রশ্ন করুন, আমরা কবির চোখে কবিদের আলোচনা শুনি।

অতনু ভট্টাচার্য - নমস্কার, আজ প্রথমেই যে কথাটা বলতে চাই তা হল, অসমিয়া এবং বাংলা— এই দুটি ভাষার দুজন বিশিষ্ট কবিকে একই মঞ্চে এই যে আপনারা সম্মান জানাচ্ছেন এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। খুবই সুন্দর একটি অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অভিভূত। এই মুহূর্তে যে কাজটি আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটি অত্যন্ত দুরূহ। কেননা কবি কালীকৃষ্ণ গুহ হলেন বাংলা কবিতার জগতে এক বিরাট স্তম্ভ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর স্থিরতা এবং তাঁর আদর্শের কারণে, যেমন তাঁর সমকালে তেমনই আমরা যারা পরবর্তী সময়ে লিখতে এসেছি তারা সকলেই তাঁর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি। তাঁর কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে সমস্ত কোলাহল থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়, কীভাবে স্থির হয়ে থাকা যায় এবং তাঁর নিজের যে ভাষা সাধনা বা কবিতা সাধনা সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তিনি আমাদের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় একজন কবি। নমস্কার, কালীকৃষ্ণ গুহঙ্গ

দুই-একটি বিষয় আপনাকে বলি, যদি আপনি এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনার মতামত জানিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। পঞ্চাশের কৃত্তিবাস এবং তার পাশাপাশি আলোক সরকার, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং পরের দিকে আপনিও শতভিষা সম্পাদনা করেছিলেন। শতভিষায় কবিতার যে দর্শন সেদিকে আমরা আপনাকে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি, কিন্তু কৃত্তিবাসের দিকে নয়। সেই দর্শন আপনাকে ঠিক কীভাবে প্রভাবিত করেছিল সে-বিষয়ে যদি আজকে একটু বলেন।

কালীকৃষ্ণ গুহ - প্রথমে যেসব অতিশয়োক্তি করলে সেজন্য ধন্যবাদঙ্গ আমরা যখন কবিতা লিখতে আসি আমাদের সামনে ছিল দুটি পত্রিকা। আপনারা সবাই জানেন এর একটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো দুই-একজনের দ্বারা সম্পাদিত কৃত্তিবাস পত্রিকা, আর অন্যটি শতভিষা পত্রিকা, যার কথা অতনু বলল। আলোক সরকার ছিলেন সেই পত্রিকার প্রধান এবং তিনি একধরনের দার্শনিক মানুষ ছিলেন। তখন আধুনিকতার দিক বলতে বোঝায় বার বার করে আধুনিকতার নবায়ন হয়েছে। আমরা এক অর্থে আধুনিকতার যুগ শুরু করি মাইকেল থেকে, তারপর অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ পার হয়ে এসে জীবনানন্দ থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু অনেক রকমের ফতোয়া দিয়েছিলেন। আধুনিকতার লক্ষণকে আধুনিক হতে হবে এই দায়িত্ব নিয়েই কবিতা লেখার সময় এল। এই দায়িত্ব বা এই ফতোয়াকে যারা অনেক বেশি বড়ো করে দেখলেন তাঁদের মধ্যে অবশ্যই ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরা, কৃত্তিবাস পত্রিকা অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনযাপনের একটা ব্যক্তিগত জীবনের উল্লাস বা একটা আনন্দ বড়ো করে দেখব। আমরা জীবন ভোগ করছি এই কথাটাই আমাদের কাছে প্রধান কথা। এর পাশাপাশি শতভিষা পত্রিকায় আলোক সরকার বলেন যে, আপনারা জানেন যে বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন মালার্মে। মালার্মের কাছ থেকে বিশুদ্ধ কবিতা লিখতে শিখতে হবে। তিনি বলেছিলেন বিশুদ্ধ কবিতার কথা ও এর লক্ষণের বিষয়ে। বিশুদ্ধ কবিতার লক্ষণ হিসেবে ইয়েট্‌স একটা কথা বলেছিলেন যে, 'যা কবিতা নয় তাকে কবিতা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে।' এই কথা আমরা আলোক সরকারের কাছেই প্রথম শুনি। তাহলে কী কবিতা কবিতা নয় যা আমরা

বাদ দেব— এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাইনি। তা সত্ত্বেও এই কথাটা মাথায় রেখেছি যে, যা কবিতা নয় তাকে আমরা কবিতা বলব না। সেই কবিতা আমরা লিখব না অর্থাৎ যা আমাদের অনুভবকে আলোকিত করে না বা একটা উচ্চ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এমন কথা আমরা কবিতায় লিখব না। আমরা কবিতা লিখে কিছু পেতে চাই না। আমরা চাই বিশুদ্ধ কবিতা বা পরিপূর্ণ অনুভবের কবিতা লিখতে। এই কারণেই আমাদের পক্ষপাতিত্ব ছিল কম প্রচারিত কৃত্তিবাস কবিতার দিকে।

অতনু ভট্টাচার্য - ধন্যবাদ কালীদাঙ্গ দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন আপনার কাছে। আপনার কবিতা পড়তে গিয়ে দেখেছি নিসর্গ, একলা মানুষের নির্জনতা, খোলা মাঠ, আগুন, মুচি, মানুষের প্রশ্ন, হাহাকার, নৈরাশ্য— এই নিয়ে আপনার কবিতা অনায়াসে কবিতা হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে আপনি যদি কিছু বলেন।

কালীকৃষ্ণ গুহ - এটা নিয়ে বলার মতো কিছু নেই যে নির্জনতা, একলা মানুষের অনুভব বা আমি যার কাছে জুতো সারাই সে তো আমার বন্ধু, তাঁকে নিয়েই কবিতা লিখি। একদিকে আমি অন্যান্য যে মানুষের সাথে মেলামেশা করছি, যেসব পশু-পাখির সঙ্গে থাকি তারাও আমার প্রতিবেশী। এই সবকিছু নিয়েই আমার জীবন। অর্থাৎ আমার কবিতায় সেগুলো আসবেই। বিশুদ্ধ চৈতন্যের একটা কথা বলা হয়। সে বিশুদ্ধ চৈতন্যকে কখনই প্রকাশ করা যায় না যদি-না তা গড়ে ওঠে এই মানুষের বা প্রকৃতির কথা বলার মধ্য দিয়ে। এর বাইরে গিয়ে এই বিশুদ্ধ চৈতন্যের কোনো জায়গা নেই।'

অতনু ভট্টাচার্য - ধন্যবাদঙ্গ একটু কবিতা থেকে সরে গিয়ে বলি, কবিকে তো শুধু একটা দিক থেকে দেখা বা চেনা যায় না। আমি আপনাকে বিব্রত করার জন্য একটি প্রশ্ন করব, সেটা হচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে আপনি যখন শিল্প ও সাংস্কৃতিক দপ্তরে প্রশাসনিক জায়গায় ছিলেন তখন আমরা জানি বিভিন্নভাবে কবিদের আপনি সাহায্য করেছেন। সাহায্য করেছেন যারা ছবি আঁকে, যারা গান করেন। অথচ আপনি বহুবার বিভিন্ন পুরস্কার থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন বা এমন একটা ব্যাপার নিজেই তৈরি করেছেন যে সে জিনিসগুলো বা বার্তাগুলো আপনার কাছে আসতেই ভয় পায়। এই শক্তিটা কীভাবে অর্জন করেছিলেন। আসলে এটা তরুণ কবি হিসেবে আমার প্রশ্ন। আমাদের জানা দরকার যে আমাদের অগ্রজ এমন একজন কবি যিনি এমন একটা জায়গায় থেকে কী করে নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে একেবারে আলাদা করতে পারলেন।

কালীকৃষ্ণ গুহ - কর্মসূত্রে আমার শিল্প জগতের সঙ্গে একটা যোগাযোগ ঘটেছিল যেহেতু আমি সংস্কৃতি অধিকর্তার চাকরি করেছি কিছুকাল। সেই সূত্রে যারা ছবি আঁকেন, গান করেন বা কবিতা লেখেন এই সমস্ত জগতের সঙ্গেই আমার একটা যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁদের সাহায্য করেছি বলে আমার মনে হয় না। বরং আমি তাঁদের সঙ্গ পেয়েছি। গানের আসরে গিয়ে গান শুনেছি দিনের পর দিন। যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁদের পেছন পেছন ঘুরে গ্যালারিতে দিনের পর দিন কাটিয়েছি অর্থাৎ তাঁদের কাছ থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি।

অতনু ভট্টাচার্য - আপনার পাঁচটি প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়েছে, গল্পের একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, বাল্যের স্মৃতি নিয়ে গত জন্মের কথা, এর পরবর্তী সংস্করণে যেটি পুনর্নির্মিত গত জন্মের কথা— এই বইটিও প্রকাশ হয়েছে। লিখেছেন দীর্ঘ কবিতা, কাব্যনাট্য অনেক লিখেছেন। আপনি যে ঘুমোতে ভালোবাসেন আপনার কবিতাই শুরু হয়েছিল যে 'আমাকে কেন ঘুম থেকে তুলে দিলে'। বহু আগে আপনার লেখা যে এখন আপনি উঠতে চাইছেন না। কী করে এত সব লিখলেন এমন একটা মনোভাব থেকে?

কালীকৃষ্ণ গুহ - একজন লেখককে তাঁর একটা অবস্থান এরকম নিতে হয় যে সমস্ত কিছুরই তাঁকে কিছু না কিছু জানতে হবে। তাঁর দর্শনের জগৎ, ইতিহাস, শিল্পের অন্যান্য জিনিস এসব তাঁকে জানতে হয়। কারণ একটা অর্থে লেখক যে বুদ্ধিজীবী একথাটা বহু ব্যবহৃত। তাঁকে সমস্ত মন খুলে জীবনযাপন করতে হয়। লেখকদের দর্শন পড়তে হয়, সাহিত্য পড়তে হয়, সমস্ত রকম শিল্পকে গ্রহণ করতে হয়। এই গ্রহণ করতে করতে যেসব কথা জমে সেগুলোই লেখা আছে তাঁর সমকালের সাহিত্য, তার আগের সাহিত্য, এইসব লিখতে লিখতে অনেক জমে গিয়েছিল বলে আমার পাঁচটা প্রবন্ধের বই হয়েছে। আর আমি তো বিছানায় শুয়েই কাটাই। গত কুড়ি বছর ধরে কাটাচ্ছি। আমার হাতে একটা বই থাকে আর তার পেছনে একটা আলো থাকে। সে আলোটা আমার বইয়ের উপর পড়ে অর্থাৎ এইভাবেই আমি রাতটি কাটাই। দিনের বেলা কিছুক্ষণ ঘুমোই। যার ফলে আমার জেগে থাকাটা কেউ দেখে না। যেহেতু ঘুমনোর সময় আমি জেগেছিলাম তাই অনেক সময় আমাকে জাগিয়ে দিতে হয়।

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	হরেকৃষ্ণ ডেকা	আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন
২০১২	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত
২০১৩	অমলেন্দু চক্রবর্তী	সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান
২০১৪	প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য	বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ
২০১৫	শিবনাথ বর্মন	বেজবরুয়ার জাতীয়তাবোধ : ইয়ার বঙ্গীয় পৃষ্ঠভূমি
২০১৬	প্রসেনজিৎ চৌধুরী	অন্য এক জ্যোতিপ্রসাদ
২০১৭	নগেন শইকীয়া	অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	তরুণ মুখোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন
২০১২	বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য	উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা
২০১৩	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল
২০১৪	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প
২০১৫	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা
২০১৬	সুমিতা চক্রবর্তী	বাংলা গদ্যের বিবর্তন : সার্ধশতবর্ষ
২০১৭	তরুণ মুখোপাধ্যায়	বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর

এবার সহ গত কয়েক বছর রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ :

সাল	উন্মোচক
২০১১	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য
২০১২	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২০১৩	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক ভবেন বরুয়া
২০১৪	বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী ও 'দৈনিক জনসাধারণ' পত্রিকার (তৎকালীন) সম্পাদক শিবনাথ বর্মন
২০১৫	অসমিয়া কবি তথা শিশুসাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমতী তোষপ্রভা কলিতা
২০১৬	অসমিয়া ও বাংলা ভাষার সুপরিচিত লেখক শ্রীমতী অণিমা গুহ
২০১৭	সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা বরগোহাঞি
২০১৮	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরী
২০১৯	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবিকা শ্রীমতী নন্দিতা ভট্টাচার্য গোস্বামী
২০২০	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী পান্নালাল গোস্বামী
২০২২	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ উষারঞ্জন ভট্টাচার্য
২০২৩	বিশিষ্ট কবি শঙ্খশুভ্র দেববর্মন

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩' সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে-দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১৫ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ড্স কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যেসব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর আরো একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

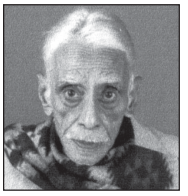

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই (২০১২) তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো' (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশঙ্কর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

তিনি ২০২১ সালের ৯ এপ্রিল প্রয়াত।

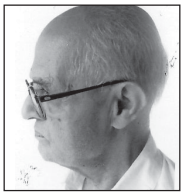

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি-যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২ ০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুর ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

তিনি ১৯ জানুআরি ২০২৩ তারিখে প্রয়াত।

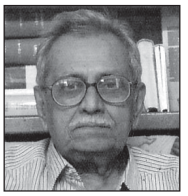

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং এই পুরস্কার প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নির্বর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। শেষদিকের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট। যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

২০১৭ সালের ২৮ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লিখেছেন, কিন্তু যা লিখেছেন সবই হয়ে উঠেছে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুআরি তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে, অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ-ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন' ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

যেসব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

তিনি ২০১৯ সালের ১৯ মে (রবিবার) প্রয়াত।

২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী ভবেন বরুয়া

শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক ভবেন বরুয়ার জন্ম উজান অসমের শিবসাগর জেলায় যোরহাট মহকুমার অন্তর্গত জানজিতে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুআরি। দেবেন্দ্রনাথ ও কাঞ্চনবালা বরুয়ার সন্তান ভবেনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেন গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে, ১৯৫৬ সালে। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পান ভবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ভবেন বরুয়া অতিবাহিত করেছেন শিক্ষকতায়। যোরহাটে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যে-কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার শেষ হয় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। মাঝখানে তিনি পাতিয়ালার পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-তেও কাজ করেছেন, ছয়ের দশকে তিনবছর ছিলেন আকাশবাণী, দিল্লির অসমিয়া সংবাদপাঠক।

ইংরেজির শিক্ষকতা করলেও ভবেন বরুয়ার অসমিয়া ভাষায় ছন্দের হাত চমৎকার। 'সোনালী জাহাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য লাভ করেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই গ্রন্থটিই তাঁকে এনে দেয় আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সাহিত্য সম্মান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'নতুন পৃথিবী' (বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠকালে প্রকাশিত), 'সোনালী জাহাজ', 'পোন্ধরটা কবিতা', 'বগা জুই কলা জুই আরু অন্যান্য কবিতা', 'অসমিয়া কবিতা : রূপান্তরর পর্ব', 'অসমিয়া কবিতা : বিবর্তনর পর্ব', 'প্রসঙ্গ : কবিতা', 'প্রসঙ্গ : বাণীকান্ত', 'প্রসঙ্গ : জ্যোতিপ্রসাদ', 'প্রসঙ্গ : ভবেন্দ্রনাথ', 'অসমর বৌদ্ধিক দুরবস্থার প্রসঙ্গত', 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া', 'সায়েন্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স'।

শিক্ষকতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভবেন বরুয়া বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সংলাপ' (অসমিয়া), 'আসাম কোয়ার্টারলি' (ইংরেজি), 'জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব গৌহাটি : আর্টস' (ইংরেজি), 'সুদর্শন' (ইংরেজি), 'নতুন পর্যায়র সংলাপ' (অসমিয়া)।

অসম তথা ভারতে ভবেন বরুয়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. সি. দেব শতবার্ষিকী বক্তৃতা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেইন্ট শংকরদেব, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব বৈষ্ণবিজ্‌ম', প্রথম আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্মারক বক্তৃতা, অসম সাহিত্য সভা আয়োজিত প্রথম আনন্দরাম বরুয়া স্মারক বক্তৃতা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মহেন্দ্র বরা স্মারক বক্তৃতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে 'ফ্রম ইমিটেশন টু ইমাজিনেশন' প্রভৃতি।

এ-ছাড়া ২০০৫ সালে সিপাঝাড়ে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৬৮তম অধিবেশনে কবিসম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। পূর্ব ইউরোপে আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় কবি হিসেবে ভবেন বরুয়াকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। সেবার তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘুরে আসেন।

ভবেন বরুয়ার পত্নী দীপা ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং চিত্রশিল্পে পারদর্শী। দুই পুত্র অঙ্কুর ও অর্পণ উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

জন্ম ১৯৫১ সালের ৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা পুরুষোত্তমপ্রসাদ দাশ, মা শেফালি দাশ। দুজনেই প্রয়াত। স্ত্রী শুক্লা দাশ।

শিক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল রাজ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)। কর্মজীবন শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিক মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। মধ্যে অল্প কিছুদিন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থায় যোগদান। প্রায় ২৮ বছর সাংবাদিকতার পর স্বেচ্ছা-অবসর। অতঃপর ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবির কাগজ কবিতার কাগজ' মাসিক 'কবিসম্মেলন'। সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখকদের সৃষ্টিশীল অবদানে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও সজীব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চির সবুজ লেখা' (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির মুখপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা' পত্রিকায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কবিতার নাম 'এই তো আমার পণ'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাগজকুচি', প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে।

ছোটদের কবিতায়ও শ্যামলকান্তির নিজস্বতা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। উপহার দিয়েছেন বেশকিছু অনবদ্য ছড়া। চমৎকার তাঁর ছন্দের জ্ঞান। বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাগজকুচি', 'প্রেমের কবিতা', 'ভূতের চরণে', 'আমাদের কবিজন্ম', 'সরল কবিতা', 'ছোট শহরের হাওয়া', 'দূর থেকে লিখি', 'বোকা মেয়ের জন্য', 'চলে যায় দিন', 'পুলকিত যামিনী', 'একলা পাগল', 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। বাংলাদেশেও শ্যামলকান্তির জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেখান থেকে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত কবিতা', 'বন্ধুর মুখোশে বন্ধু', 'ভেসে বেড়াবার আনন্দ', 'ঝুপসি দিদির গানের বাড়ি', 'প্রিয় ১০০ কবিতা', ও 'ধানী পটকা' (বড়দের ছড়া)।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাবুইবাবু', 'চাইছি ঘুড়ি মাঞ্জা সুতো', 'পাতায় মোড়া বাঁশি', 'পাখি সব করে রব', 'বাঘের গায়ে হলদে জামা', 'শ্রেষ্ঠ ছড়া' এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'আমপাতা জামপাতা' ও 'মনে কর ঘুমিয়ে আছিস'।

বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'কবিসম্মেলন' ছাড়াও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতীতি', 'জনপদ', 'কবিতা সংবাদ', 'কনসার্ট', 'আত্মজ' প্রভৃতি। সম্পাদিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। সম্পাদিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : 'হাজার কবির হাজার কবিতা', 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'লেখক সত্যজিৎ রায়', 'আহ্লাদে আটখানা', 'দুই বাংলার প্রাণের কবিতা', 'দুই বাংলার আবৃত্তির কবিতা', '১০০ ছড়া ১০০ ছবি', 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', 'চেনা সুনীল অচেনা সুনীল', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রভৃতি।

কবি ও কবিতা নিয়ে নানারকম কাজে শ্যামলকান্তি সর্বদাই অক্লান্ত। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'সৌহার্দ্য ৭০', 'সারা ভারত কবিতা উৎসব', 'বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব', 'সারা বাংলা শিশু সাহিত্য উৎসব', 'সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলন' প্রভৃতি।

অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত। তার মধ্যে রয়েছে : জীবনানন্দ পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, তুষার রায় পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সাধনা চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার, লেখক সম্প্রীতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, আনন্দ স্নোসেম পুরস্কার (শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণ' কবিতার জন্য), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (মালদহ), শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, ডা. ওয়াজেদ স্মৃতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), আনিকা ইউসুফজাই স্মৃতি পুরস্কার (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ), ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার (কোচবিহার, দু-বার, কবিতা ও সম্পাদনার জন্য), কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

২০০৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত 'জাতীয় কবি'র সম্মান, গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশের বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্যামলকান্তির একাধিক কবিতা।

২০১৫ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক হরেকৃষ্ণ ডেকার জন্ম ১৯৪৩ সালে, উজান অসমের তিনসুকিয়ায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর।

এরপর বছর তিনেক একটি কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষ পর্যন্ত অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস হয়ে অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠান করেও হরেকৃষ্ণ ডেকা কবিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। খুব ছোটবেলা থেকেই দৈনিক সংবাদপত্রে লেখালিখি করতেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বরবর'। এরপর লিখেছেন 'রাতির শোভাযাত্রা', 'আন এজন', 'ভাল পোয়ার বাবে এযার', 'ছানমিয়ালি বর্ণমালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'আন এজন' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শুধু কবিতা নয়, হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যজগতে চিরকালের জন্য স্মরণযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবেন ছোটগল্পের জন্যও। তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'প্রাকৃতিক আরু অনন্যা', 'মধুসূদনর দলং', 'বন্দিয়ার', 'পোস্ট-মডার্ন অথবা গল্প', 'মৃত্যুদণ্ড' এবং 'গল্প আরু কল্প'। 'বন্দিয়ার' গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে 'কথা' পুরস্কার পেয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার আলোচনাগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। 'আধুনিকতাবাদ আরু অন্যান্য প্রবন্ধ', 'দৃষ্টি আরু সৃষ্টি', 'নীলমণি ফুকন : কবি আরু কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অসমিয়া সাহিত্যের হালহকিকত নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া লিখেছেন দুটি উপন্যাস— 'আগন্তুক' ও 'তরুণ প্রজন্মর কবিতা'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর যে-কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের প্রতীক। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তিনি।

সাহিত্য অকাদেমি ও কথা সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান— উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার।

২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রত্নেশ্বর হাজরা

বাংলা কাব্যজগতে গত শতকের ছয়ের দশকের কবি রত্নেশ্বর হাজরার জন্ম অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার ভরতকাঠি গ্রামে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক বাঁধনহারা হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার অভিঘাতে উদ্‌বাস্তু হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে শুরু হয় নতুন জীবন। স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির উদ্দেশ্যে মোটর মেকানিজ্‌ম শিখতে শুরু করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্মোমিটার তৈরির একটা কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুটিই ছিল অসমাপ্ত। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর।

কলেজ-জীবন থেকে কবিতাচর্চার শুরু। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছাড়া তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও 'তরুণের স্বপ্ন' প্রভৃতি ঐতিহ্যশালী পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'লোকায়ত অলৌকিক', 'জলবায়ু', 'গতকাল আজ এবং আমি', 'এদিকে দক্ষিণ', 'রাজি আছি', 'উপত্যকায় একা', 'আছি নির্বাসিত', 'নিজস্ব মানচিত্র', 'শেখানো ছবিগুলো', 'ধুলোস্নান' প্রভৃতি। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া/কবিতার বই— 'মেঘের দিদা বরফদানা', 'রত্নমালার যাদুকর', 'সবুজ পরিকে নেমন্তন্ন', 'মাটির ঘড়া স্বপ্নে ভরা', 'অলীকপুর একটু দূর' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ছয়টি কাব্যনাটকের সংকলনও।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামবাংলার জলকাদার গন্ধ, শোনা যায় সুপুরিবাগানে ঘুঘুর উদাস-করা ডাক, ছবি হয়ে ওঠে বনপিপুল, অম্লবেতস, আমলকী, শতমূলী প্রভৃতি দৃশ্যের অনুষঙ্গ।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন কবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার, মহাদিগন্ত পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা, শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।

২০১৬ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

সনন্ত তাঁতি

আধুনিক অসমিয়া কবিতার নীরব সাধক সনন্ত তাঁতির জন্ম ১৯৫২ সালের ৪ নভেম্বর, অসমের বাংলাদেশ-সংলগ্ন বরাক উপত্যকায় করিমগঞ্জ জেলার কালীনগর চা-বাগানে। ওড়িয়াভাষী চা-বাগান শ্রমিকের সন্তান সনন্ত নিকটবর্তী শহর রামকৃষ্ণনগরে বড় হয়ে ওঠেন। পরে শৈলশহর শিলঙে পড়াশোনা এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।

ছেলেবেলাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। স্বভাবতই এই ভাষার প্রেমে পড়েন, যা আজও অম্লান। তাঁর প্রথম রচনাও বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রেমের কবিতা। যৌবনে যোরহাটে বসবাসকালে তিনি অসমিয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা উপলব্ধি করেন, যা অসমিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে এবং এই ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সনন্ত এমন একজন কবি যাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া, শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে আর কবিতা রচনা অসমিয়া ভাষায়— নিঃসন্দেহে এ এক বিরল কৃতিত্ব। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর জীবন ও সংবেদনশীলতা আশির দশকে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনগুলিতে তাঁর কবিতায় জুগিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

সনন্তের অসমিয়া কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তেরো। তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য যেমন পাঠকের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনই সমালোচকদের দ্বারাও উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'উজ্জ্বল নক্ষত্রর সন্ধানত' প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে, চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। সনন্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নিজর বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তাব' (১৯৯০), 'শব্দত অথবা শব্দহীনতাত' (১৯৯৩), 'মৃত্যুর আগর স্টপেজত' (১৯৯৬), 'টেপনিতো কেতিয়াবা বারিষা আহে' (১৯৯৭), 'ধুঁয়া ছাইর সপোন' (১৯৯৯), 'দীর্ণ বসন্তর সৌরভ' (২০০২), 'আপুনি আপোনার স'তে যুদ্ধ করিব পারিবনে' (২০০৪), 'মই' (অর্থাৎ 'আমি', ২০০৮), 'মোর নিরাভরণ আত্মার শোকাবহ শব্দবোর' (২০১০), 'কাইলর দিনটো আমার হ'ব' (২০১৩)। গত মাসে (ফেব্রুআরি, ২০১৭) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'মোর প্রিয় সপোনর ওচরে-পাঁজরে' আর তাঁর কবিতার দিব্যজ্যোতি শর্মা কৃত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems'.

সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির লেখকদের সম্মেলন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সনন্ত। তিনি ইতিমধ্যেই যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯২ সালে অসম কবি সমাজ প্রদত্ত মৃণালিনী দেবী গোস্বামী পুরস্কার, ২০০২ সালে বীর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার, ২০১১ সালে চর চাপোরি সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ওসমান আলি সদাগর সমন্বয় পুরস্কার, ২০১৪ সালে ক্রান্তিকাল পুরস্কার, ২০১৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত নিজরা কবি শৈলধর রাজখোয়া পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে এপিপিএল প্রদত্ত শিরিষ-অয়েল সাহিত্য পুরস্কার। এর পরে পেয়েছেন উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০১৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০১৮), যোরহাট কলেজ থেকে প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে 'মহাজোসিয়ান' সম্মান (২০১৯) এবং মেঘরাজ কর্মকার সাহিত্য পুরস্কার (২০২০)।

অসম সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন চা-শ্রমিকদের পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত অর্ধ-সরকারি সংস্থা থেকে ২০১২ সালে ডেপুটি পিএফ কমিশনার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন সনন্ত, তার পরও ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ওই সংস্থায় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে কাজ করেছেন।

সনন্ত ২০২১ সালের ২৫ নভেম্বর প্রয়াত।

২০১৬ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী উদয়ন ঘোষ

জন্ম ১৯৪৩ সালে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ইমফল, শিলচর, গুয়াহাটি আর শিলঙে। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লেখেন উদয়ন, পরবর্তীকালে প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। কর্মজীবন কেটেছে শিলং কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিশোরীমোহন পাঠক আর পরশকুমার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অল্পস্বল্প গবেষণাও করেছেন।

বর্তমানে কলকাতা নিবাসী উদয়ন একসময়ে শিলচরের বিখ্যাত কবিতা-পত্রিকা 'অতন্দ্র'-র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ১৯ বছর। যখন যেখানে থাকেন সেখানেই ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা তাঁর অন্যতম নেশা। মার্ক্সবাদী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ভাষার নির্বাচিত কবিতা সংকলন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, সংকলনটি সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। উদয়নের কিছু-কিছু অনুবাদ পেঙ্গুইন-এর এক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে উদয়নের যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঝোপ জঙ্গলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কমলকুমার বোধিনী-১', 'হরিশ্চন্দ্র' (বনসাই উপন্যাস) আর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দেড়শো বছর'। এ-ছাড়াও রয়েছে 'অর্কিড উপত্যকার ভালোবাসার গান', 'নাগা পাহাড়ের গান', 'পয়েন্টেলিস্টের আত্মকথা', 'কমলকুমার বোধিনী-২', 'উড়ো কবিতার ঝুড়ো ফুল', সংলাপ কাব্য 'রক্ত সিংহাসন' ও 'ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন', প্রবন্ধ সংকলন 'একথা, ওকথা, মাতকথা' এবং 'সলোমনের গান'।

হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছেন ২০০৭ সালে।

২০১৭ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী সমীর তাঁতী

কবি সমীর তাঁতীর জন্ম বেহোরা চা বাগানের মিকিরচাঙে, ১৯৫৫ সালে। স্থানীয় রাজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পড়াশোনা করার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে অসমিয়া সাহিত্যের দিকপাল হীরেন গোহাঁই, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোবিন্দপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে। যাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

সমীর তাঁতী কর্মজীবন শুরু করেন 'সাদিনিয়া নাগরিক' কাগজে সহকারী সম্পাদক রূপে। যাঁর সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি। সেই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে'।

এর পর দুর্গেশ্বর দত্ত নিয়মিত সমীর তাঁতীর কবিতা প্রকাশ করতেন তাঁর পত্রিকা 'পান্থদীপ'-এ। কর্মজীবনে থিতু হওয়ার আগে সমীর তাঁতী কাজ করেছেন চাংসারির শরাইঘাট কলেজে লেকচারার হিসেবে, খানাপাড়ার গণেশ মন্দির বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে, অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অনুবাদক রূপে, দেড় বছর কাজ করেছেন ইংরেজি দৈনিক 'দ্য সেন্টিনেল' পত্রিকায় প্রুফরিডার হিসেবে। ১৯৮৪ সালে যোগ দেন অসম সরকারের পর্যটন বিভাগে। এবং সেখান থেকেই ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে।

এ-যাবৎ সমীর তাঁতীর তেরোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়া রয়েছে সাহিত্য ও সমালোচনামূলক চারটি গ্রন্থ, আফ্রিকার কবিতা ও প্রেমের গান এবং জাপানের ভালোবাসার কবিতা নামক দুটি অনুবাদ গ্রন্থ, দুটি সম্পাদিত ছোটগল্প সংকলন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল 'যুদ্ধভূমির কবিতা' (১৯৮৫), 'কদম ফুলর রাতি' (২০০১), 'শোকাকুল উপত্যকা' (১৯৯০), 'সময় শব্দ সপোন' (১৯৯৬) প্রভৃতি।

২০১২ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মর্যাদাসম্পন্ন অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার। ছগনলাল জৈন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি কর্তৃক সংবর্ধিত সমীর তাঁতী ১৯৮৭ সালে অংশগ্রহণ করেন ভোপালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান পোয়েট্রির প্রথম অধিবেশনে। ভোপাল সহ দেশের বিভিন্ন শহরে তিনি যোগ দিয়েছেন সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, নতুন দিল্লি, পাটনা, মুম্বাই, কোচি, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতি শহর।

২০১৭ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিত বাইরী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কনকপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কবি অজিত বাইরী। স্কুল-হোস্টেলে মাঝরাতে লণ্ঠনের আলোয় প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন অকালপ্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে।

কৈশোরোত্তীর্ণ দিনগুলিতে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল কারখানার ফাইফরমাস খাটার কর্মী ও পরে হাওড়া স্টেশনে কুলি-কামিনদের রেশনের মাল খালাসের হিসাবরক্ষক হিসেবে। ১৯৭১-এ সরকারি চাকরিতে যোগ দেন তিনি। ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উপ-প্রকল্প অধিকর্তা (কৃষি) পদ থেকে অবসরগ্রহণ।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তকে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় কবি অজিত বাইরীকে।

অজিত বাইরীর এ-যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ২৬টি, উপন্যাস দুটি, গল্প সংকলন একটি, স্বরচিত কবিতার আলোচনাগ্রন্থ একটি, আত্মকথামূলক গদ্যগ্রন্থ একটি, দুই বাংলার কবিদের নিয়ে এবং অন্যান্য সম্পাদিত কবিতার সংকলন সাতটি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া', 'বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত', 'প্রিজনভ্যান এবং কালপুরুষ', 'হরীতকী বনের রোদ', 'সন্ধ্যাতারার মতো মেয়েটি', 'আগুনের চাদর', 'শব্দের টেরাকোটা', 'ধুলো থেকে তুলে নেব স্তব', 'পরিব্রাজকের ঝুলি', 'অর্ধেক আকাশ তুমি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিমুখ (১৯৮০-১৯৮৬), কৃত্তিকা (২০০৮-২০১০)।

কবি ও প্রাবন্ধিক তপনকুমার মাইতি সম্পাদিত 'সির্জন নদীর কবি : অজিত বাইরী' গ্রন্থে কবির কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক।

কবিতার পাশাপাশি অজিত বাইরী একজন কৃষি-বিশেষজ্ঞ। চাকরিসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল। নোনা ভূমিতে আধুনিক কৃষিকর্ম কীভাবে করা যায় সেসব হাতেকলমে তিনি শিখিয়েছেন কৃষকদের।

২০১৮ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অনুভব তুলসী

অসমিয়া কাব্যজগতে অনুভব তুলসী উজ্জ্বল এক ধ্রুবতারা। নগাঁওয়ের তুলসীমুখে ১৯৫৮ সালে জন্ম এই কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নাজমা'। একটি বাক্যে তাঁর কবিতার মূল সুরকে ধরা যায় না, এটাই কবির বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি ভালোবাসা যদি হয় তাঁর কবিতার অনন্য সুর, তাহলে আঞ্চলিকতার পাশাপাশি বিশ্বজনীনতা আরেকটি প্রধান উপাদান। কল্পনা, পুরাণ, লোকজ উপাদান, প্রেম, সমাজমনস্কতা পাশাপাশি খেলা করে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তিতে।

প্রখ্যাত কবি, সমালোচক কে সচ্চিদানন্দ লিখেছেন, 'অনুভব তুলসীর কবিতা গভীর ও সৎ; একইসঙ্গে স্থানিক ও বিশ্বজনীন। চমৎকার লিরিকের পাশাপাশি বর্তমান ও অতীতের দার্শনিকতা তাঁর কবিতায় দৃষ্ট।'

'ইন্ডিয়ান লিটারেচার'-এর সম্পাদক এ জে টমাস বলেছেন, 'অনুভব তুলসীর কবিতা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যক্তির অনন্যতার দিকে। কী বিষয় তিনি লিখছেন সেটা কথা নয়, যা-ই লিখুন-না কেন, তার থেকে সবচেয়ে বেশি নির্যাস তুলে আনেন তিনি।'

এটা লেখা অত্যুক্তি হবে না যে অনুভব তুলসী অসমিয়া কবিতায় নতুন বেঞ্চমার্ক তৈরি করেছেন। 'নাজমা' প্রকাশের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে কবিতায় ফর্ম ও কনটেন্ট নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন তিনি। কল্পনার সঙ্গে বাস্তব, আধুনিকতার সঙ্গে পুরাণ, গ্রামীণ সংস্কৃতির সঙ্গে শহুরে জীবনের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর কবিতায়।

শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, বেশ কয়েকটি সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক কবিতা সম্মেলনে অংশগ্রহণের সূত্রে বাংলাদেশের ঢাকা, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, টেক্সাস, গ্রিসের এথেন্স প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ ঘটেছে তাঁর।

শুধু কবিতা বা সমালোচনা নয়, চলচ্চিত্র সম্পর্কেও অত্যন্ত আগ্রহী অনুভব তুলসীর চলচ্চিত্র বিষয়ক সমালোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

অনুভব তুলসীর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'দিন রাতির দুয়ারী', 'জুই চোর', 'জয় জয়তীর জয়', 'চরাইর চকুত ফুলর বিছনা', 'পানীকাউরী', 'জীবনানন্দর দেহান্তরর দৃশ্য', 'দেও চেলেং', 'বরষুণর খেতিয়ক' প্রভৃতি।

কাব্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ : অসমিয়া কবিতা আরু তুলনামূলক অধ্যয়ন, সৃষ্টি সুষমা, ইলোরার ইন্দ্রসভা।

গল্প সংকলন : গোলাপ গছত থৈ যাবি।

চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালিখি : বর্ণ কল্প, নিউ ওয়েভ ফ্রেঞ্চ সিনেমা : জাঁ লুক গদার।

সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ : জয় জয়ন্তী, অমূল্য বরুয়ার কবিতা, তরুণ প্রজন্মর কবিতা।

সম্পাদিত গবেষণামূলক জার্নাল : কনফ্লুয়েন্স, ডিসকোর্স।

বিভিন্ন সম্মান ও পুরস্কারে সম্মানিত কবি গ্রিসের এথেন্সে অষ্টম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া অসম সাহিত্য সভার শিবসাগর ও হোজাই অধিবেশন, ঢাকায় জাতীয় কবিতা উৎসব, নতুন দিল্লিতে সার্ক সাহিত্য উৎসব, তুরস্কে রাইটার্স ও লিটারেরি ট্রান্সলেটর্স ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর পেয়েছেন জমিরুদ্দিন আহমেদ সাহিত্য পুরস্কার (২০১৯) এবং অসম কেশরী অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী পুরস্কার (২০২০)।

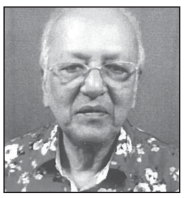

২০১৮ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী পীযূষ রাউত

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতাচর্চার জগতে পীযূষ রাউত অনন্য। তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্টের মেহেরপুরে ১৯৪০ সালে জন্ম, কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে, 'বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ'। কবিতা লেখার শুরু হয়েছিল ছাত্রাবস্থায়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে কবিতার কাগজ সম্পাদনা করেন। ত্রিপুরার প্রথম কবিতা-পত্রিকা 'জোনাকি' প্রকাশিত হয় তাঁরই সম্পাদনায়। চলেছিল ১৯৬৩-৭৭ পর্যন্ত। এখানেই শেষ নয়, ত্রিপুরার প্রথম গল্প-পত্রিকা 'স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন'ও তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৯-৭৪ পর্যন্ত। একইসঙ্গে তিনি সম্পাদনা করেছেন কবিতা ও গল্পের কাগজ। এ ছাড়া সম্পাদনা করেছেন আরও কয়েকটি পত্রিকা, সেগুলি হলো 'খোয়াই', 'অরণ্যে আমরা', 'সবিনয় নিবেদন'।

পীযূষ রাউতের কবিতার নির্মাণ শুরু হয় কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনা থেকে, ক্রমশ পৌঁছে যায় তা অমরত্বের আঙিনায়। ফুটে ওঠে নাগরিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা, ক্ষোভ ও ক্রোধ। পাশাপাশি জীবনকে যাপন, সমাজজীবন ও ভালোবাসার পরশও পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়।

পীযূষ রাউত সমাজমনস্ক কবি। স্বাভাবিকভাবে তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা অবশ্যম্ভাবীরূপেই জড়িয়ে থাকে। প্রকৃতির রূপবর্ণনা কিংবা নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম নয়, এই কবির কবিতা কিছু বলতে চায়, যা পাঠকের মনে রেখে যায় গভীর ছাপ।

তাঁর এ-পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হল— বিষণ্ণ উদ্যানে ; জন্ম জুয়াড়ী ; নষ্ট আশ্বিনের মেঘ ; প্রিয় কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত পঙ্‌ক্তিমালা ; অবসরের আগে ও পরে ; মন্ত্রপূত রুমাল ; স্যার, আপনার টেলিফোন; তোর্ষা সিরিজ ; শ্রীচরণেষু বাবা ; চিনিকম; হ্যালো চীফ্ মিনিষ্টার ; জয় হে ; আমরা কয়েকজন ; আমার অণুকবিতা ; জোনাকি সমগ্র ; ইতি তোমারই।

পীযূষ রাউত ছোটগল্পে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর 'অরুণের আত্মসমীক্ষা ও অন্যান্য গল্প' পড়লেই তার রেশ পাওয়া যায়। এ ছাড়া তিনি লিখেছেন আত্মকথা— 'আমার কবিজীবন'।

দীর্ঘ কাব্যজীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সংবর্ধনা পেয়েছেন পীযূষ রাউত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য — পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কবিতা উৎসবে সংবর্ধনা, ত্রিপুরায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাহিত্য সম্মেলনে সংবর্ধনা, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, ত্রিপুরা সরকার প্রদত্ত 'কবি সুকান্ত পুরস্কার', প্রবাহ সাহিত্য সম্মান, নন্দিনী স্মৃতি সাহিত্য সম্মান, নন্দিত প্রিয়জন সম্মান, শিলচরের বরাকবার্তা প্রদত্ত কবিরত্ন সম্মান প্রভৃতি।

বাংলাভাষার গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব কবিতা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশ, কৃত্তিবাস, প্রতিক্ষণ, কবিসম্মেলন, বিভাব প্রভৃতি।

২০১৯ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলিম কুমার

পেশায় চিকিৎসক হলেও আধুনিক অসমিয়া কবি হিসেবে নীলিম কুমার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৬১ সালে, প্রথম কবিতা লেখেন একুশ বছর বয়সে। তাঁর কবিতায় সুররিয়ালিজ্‌ম-এর সঙ্গে পাওয়া যায় স্বপ্নের উদ্ভাস। কবিতা ছাড়াও উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

নীলিম কুমারের কবিতা-গ্রন্থের সংখ্যা সতেরো, সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে তিনটি উপন্যাস ও একটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ। তাঁর কবিতা যেসব ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত তার মধ্যে রয়েছে হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কন্নড়, উর্দু, বাংলা, মালয়ালম, ওড়িয়া, নেপালি, ফরাসি, জার্মান, স্প্যানিশ ও ইংরেজি।

তাঁর দুটি ইংরেজি কবিতা-সংকলনের নাম 'প্রস্টিটিউট মুন অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' এবং 'সানশাইন হ্যাজ নো হোম'। বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে তাঁর কবিতা অন্তর্ভুক্ত।

কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভুবনেশ্বরের ধৌলী বুক্‌স থেকে নীলিমের কবিতার দুটি হিন্দি সংকলন প্রকাশিত। অন্যান্য যেসব সংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'সং ফ্রম দ্য সিশোর' (পোয়েট্রি ফ্রম দ্য ইন্ডিয়ান ওশন), 'ওআন হানড্রেড ইন্ডিয়ান পোয়েট্‌স', 'ইন্ডিয়া ইন ভার্স', 'ড্যান্সিং আর্থ' (পেংগুইন বুক্‌স), 'কবি ভারতী', '১০০ গ্রেট ইন্ডিয়ান পোয়েট্‌স' প্রভৃতি।

'ইন্ডো-ফ্রেঞ্চ কালচারাল রিলেশন্স'-এর অধীনে তিনি ভারতীয় কবি হিসেবে ফরাসি দেশে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ-ছাড়াও সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে আয়োজিত কবিসম্মেলনে বাংলাদেশ ও লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণ করেছেন। তিনি যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিতা-উৎসবে যোগ দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার্ক পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যাল, আইওআরএ ফেস্টিভ্যাল, কেরল সাহিত্য উৎসব, ওএএলএফ ফেস্টিভ্যাল, কালা ঘোড়া আর্ট ফেস্টিভ্যাল, কবি ভারতী (ভোপালের ভারত ভবনে), আকাশবাণী আয়োজিত জাতীয় কবিসম্মেলন, সার্ক রাইটার্স কনফারেন্স, ব্যাঙ্গালোর পোয়েট্রি ফেস্টিভ্যাল, দিল্লিতে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সৃষ্টিশীল সম্প্রদায়ের মিলনোৎসব। সাহিত্য আকাদেমি আয়োজিত প্রায় ৪০টি কবিসম্মেলনে তিনি এ-পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন।

নীলিম কুমার ভোপালের ভারত ভবন-এর উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য।

কবি হিসেবে তিনি বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী। পেয়েছেন উদয় ভারতী জাতীয় পুরস্কার, ডিস্টিংগুইশ্‌ড লিডারশিপ অ্যাওআর্ড (ইউএসএ), রাজা ফাউন্ডেশন পুরস্কার, শব্দ পুরস্কার, একা এবং কয়েকজন সম্মান এবং মানব সম্পদ বিকাশ ফেলোশিপ।

২০১৯ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রণজিৎ দাশ

জন্মসূত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হলেও রণজিৎ দাশ বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তাঁর সুস্পষ্ট নাগরিক কণ্ঠস্বরে যুক্ত হয়েছে এক নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি।

রণজিতের জন্ম অসমের শিলচর শহরে, ১৯৪৯ সালে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করার পরে কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। ২০০৬ সালে সেই চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পত্নী ও এক পুত্র সহ স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন। ফুটবল যেমন তাঁর প্রিয় খেলা তেমনই বিশেষ আগ্রহের বিষয় ফিল্ম ও দর্শনশাস্ত্র।

এ পর্যন্ত রণজিতের বাংলা কবিতার এগারোটি সংকলন প্রকাশিত। সেগুলি যথাক্রমে 'আমাদের লাজুক কবিতা' (১৯৭৭), 'জিপসিদের তাঁবু' (১৯৮৪), 'সময়, সবুজ ডাইনি' (১৯৮৭), 'বন্দরের কথ্যভাষা' (১৯৯৩), 'ঈশ্বরের চোখ' (১৯৯৯), 'সন্ধ্যার পাগল' (২০০৪), 'সমুদ্র সংলাপ' (২০০৭), 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' (২০১০), 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা' (২০১৩), 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন' (২০১৬), এবং 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' (২০১৮)। এ ছাড়াও রয়েছে 'বিয়োগপর্ব' (১৯৯৭) এবং 'শ্যামাপোকা' (২০০০) নামে দুটি উপন্যাস আর সাহিত্য-সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ ('খোঁপার ফুল বিষয়ক', ২০০৬ এবং 'কবিতার দ্বিমেরুবিশ্ব', ২০১১)।

বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা রূপা অ্যান্ড কোং থেকে 'আ সামার নাইটমেয়ার অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' নামে রণজিতের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ পেয়েছে ২০১১ সালে।

রণজিতের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে বড়সড় একটি কবিতা-সংকলন ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী রণজিৎ, যার মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতা পাঠ করেছেন। ভারত-ক্রোয়েশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রামের অধীনে এক সাহিত্যিক সফরে ক্রোয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন ২০১২ সালে।

২০২১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী আনিছ উজ জামান

জনপ্রিয় অসমিয়া কবি আনিস উজ জামান-এর জন্ম শিবসাগর জেলার অন্তর্গত বামুনবাড়ি গ্রামে, ১৯৪৭ সালের ৩ ফেব্রুআরি। তাঁর পিতামাতা প্রয়াত দাউদ শ্বাহ আর প্রয়াত বদিরা খাটুন। শ্রীজামান ১৯৭১ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অসমিয়া ভাষা-সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। প্রায় এগারো বছর মির্জা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার পর অসম লোক সেবা আয়োগ-এর সদস্যপদ অলংকৃত করেন। তিনি বেশ কয়েকটি কাব্যসংকলন ও গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা। এ ছাড়াও তাঁর কবিতা ও গীতের দুটো শ্রাব্য ক্যাসেট রয়েছে।

তাঁর কবিতা বাংলা, হিন্দি, ওড়িয়া, তামিল ছাড়াও ইংরেজি, ফরাসি ও স্প্যানিশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনূদিত তাঁর কবিতা-সংকলনটির নাম 'আনিস উজ জামানের কবিতা'। অসমিয়া কবিতার বইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'অজ্ঞাতে', 'গধূলি', 'সেউজিয়া জোন', 'এই বাটেদিয়েই দোকমোকালি', 'নৈখন কলৈ গৈছে তুমিও নেজানা মইও নেজানো', 'নির্বাচিত কবিতা' (এটি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠ্য)। এ ছাড়া রয়েছে জাপানি হাইকুর অনুবাদ 'ধুমুহার পাছত' এবং হিন্দিতে অনূদিত 'হরা চান্দ'।

সৃষ্টিশীল রচনা ছাড়াও তিনি যেসব গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে 'জনচেতনার কবি রাম গগৈ', 'অমূল্য বরুয়া দৃষ্টি আরু দর্শন', 'শব্দহীন বর্ণমালা', 'প্রজ্ঞা সিন্ধু কবি মফিজুদ্দিন' (এটি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠ্য), 'সাত সমুদ্রত শংখ বাজিছেনে নাই', জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি নীলমণি ফুকন সম্পর্কিত রচনা। রাজীব বরার সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন পার্বতীপ্রসাদ বরুয়ার বিষয়ে 'খেল ভঙা খেল' এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বরুয়া সম্পর্কে 'রাজহাউলির পরা ছবিগৃহলৈ'। এর বাইরে রয়েছে ছোটদের জন্য পাঁচটি গ্রন্থ।

তাঁর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচক হীরেন গোহাঁই বলেছেন, নিতান্ত ঘরোয়া ভাষা আর পরিচিত পরিবেশ থেকে গড়া চিত্রকল্প দিয়ে আনিছ উজ জামান তাঁর কবিতায় প্রাণসঞ্চার করেছেন। সাধারণ শব্দগুলোও হয়েছে ইঙ্গিতমুখর ও বাঙ্ময়। তিনি বেশকয়েকটা অবিস্মরণীয় সার্থক কবিতা উপহার দিয়েছেন। তাঁর কবিতা আধুনিক অসমিয়া কাব্য-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তা সত্ত্বেও এক স্পষ্ট, অনন্য নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে।

'অসম সাহিত্য সভা'-র আজীবন সদস্য আনিছ উজ জামান সারা অসম কবি সম্মেলনের প্রাক্তন সভাপতি। তিনি বর্তমানে গুয়াহাটির স্থায়ী বাসিন্দা এবং ইতিমধ্যে যেসব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে 'সাহিত্য জ্যোতি', 'কাব্য হৃদয়', 'একুশে সম্মান', 'কবি অনুপম কুমার অনুবাদ পুরস্কার', 'ড. ধ্রুবজ্যোতি বরা সাহিত্য পুরস্কার' এবং মেঘালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'রাইটার্স এক্সেলেন্স অ্যাওআর্ড'।

২০২১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী কালীকৃষ্ণ গুহ

কিরণচন্দ্র ও আশালতার সন্তান কালীকৃষ্ণ গুহ-র জন্ম অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশে রাজবাড়ি) জেলার ছাইবাড়িয়া গ্রামে, ১৯৪৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং দেশভাগের কারণে বাল্যজীবন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কেটেছে। গ্রামের বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে রাজবাড়ি শহরে এসে মাসির বাড়িতে থেকে গোয়ালন্দ হাই স্কুলে দু-বছর পড়ার পর কালীকৃষ্ণকে কলকাতায় চলে আসতে হয় ১৯৫৭ সালে। তার পর থেকে ওই মহানগরেই তাঁর স্থায়ী বসবাস।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে করণিক হিসেবে চাকরিজীবন শুরু করেন কালীকৃষ্ণ। কিছুদিন পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি রাজ্য সিভিল সার্ভিসে (ডব্লিউ বি সি এস) যোগ দেন। কলা ও আইনে স্নাতক কালীকৃষ্ণ যোগ্যতার সঙ্গে আমলার দায়িত্ব পালন করে উপ সচিব হিসেবে স্বেচ্ছাবসর নেন ২০০২ সালে।

তাঁর কবিতাচর্চার শুরু গত শতকের ষাটের দশকের সূচনায় কলেজজীবনের প্রারম্ভে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তাক্ত বেদীর পাশে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এখন পর্যন্ত কালীকৃষ্ণের প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা পঁচিশ, এ-ছাড়া রয়েছে দুটি কাব্যনাটক, একটি গল্প-সংকলন আর বিভিন্ন বিষয়ে পাঁচটা গদ্যগ্রন্থ। দে'জ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এবং ঋক প্রকাশন বের করেছে কবিতাসংগ্রহের দুটি খণ্ড। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('নির্বাসন নাম ডাকনাম', ১৯৭২) প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান পাঁচ বছরের। তার পর থেকে প্রতিটি দশকেই কালীকৃষ্ণের একাধিক বই প্রকাশ পেয়েছে।

কালীকৃষ্ণের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হে নিদ্রাহীন' (১৯৮৮), 'অন্ধত্বের প্রশ্নে জড়িত' (১৯৯১), 'খণ্ডিত সেই সূর্যোদয়' (১৯৯৪), 'অক্ষয়বটের দেশ পার হই' (১৯৯৭), 'গতজন্মের গ্রীষ্মকাল' (২০০১), 'অপার যে বিস্মরণ' (২০০৬), 'মলিন পাঠগ্রহণ' (২০১০), 'মালেকমাঝির ঘাট' (২০১৩)। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর চারটে কবিতা-সংকলন— 'বাড়িটা অন্ধকার হয়ে আছে', 'অস্তমিত পানাহার', 'তোমার অনুপস্থিতির পাশে', 'এই বিচরণভূমি'। আর সম্প্রতি প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'গতজন্মের কথা' (বাল্যস্মৃতি), 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' (নিবন্ধ), 'হেমন্তে আয়োজিত পাঠ' (প্রবন্ধ), 'অক্ষয়বটের দেশ' (প্রবন্ধ) এবং 'পিপুলগাছ থেকে পরিমল সোমের প্রশ্ন ও নীরবতা' (গল্প-সংকলন)।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত কালীকৃষ্ণ নিরীশ্বরবাদী অথচ কল্যাণভাবাশ্রয়ী, এই কবি প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পান সামগ্রিক সৃষ্টিরহস্য। তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদী মননের প্রেক্ষিতে রয়েছে এই মহাবৈশ্বিক প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আস্থা অপরিসীম, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান কবিতা ও সংগীতের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয়। সেইসঙ্গে কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস করেন, যে-কোনো লেখক ও শিল্পীরই থাকা উচিত সেই অহংকার যা আত্মরক্ষার সহায়ক, এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময়ে সমস্ত রকম হিংসা পরিত্যাজ্য। কাব্যকৃতির জন্য তিনি একাধিক ছোট পত্রিকা থেকে সম্মাননা লাভ করেছেন।

২০২২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী রবীন্দ্র সরকার

অসমিয়া কবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করলেও রবীন্দ্র সরকার জন্মসূত্রে বাঙালি। তাঁর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)। বাবা অপূর্বকুমার সরকার, মা সুনীতি সরকার, স্ত্রী শেফালি সরকার এবং আত্মজা চন্দনা রায় স্কুল-শিক্ষিকা। গুয়াহাটির বাঙালি উচ্চ-বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে আই. এ. এবং তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন রবীন্দ্র সরকার।

সাময়িকভাবে স্কুল-শিক্ষকতা ও ব্যাংকে কাজ করার পরে তিনি ভারতীয় জীবন বিমা নিগমে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন এবং ওই সংস্থা থেকেই অবসর নেন।

আজীবন কবিতার সাধনায় মগ্ন থাকলেও তিনি প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক হিসেবেও সক্রিয় ছিলেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও অবদান অনস্বীকার্য।

তাঁর অসমিয়া কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'বৃত্ত ভঙার সময়', 'সত্তরর পদাতিক', 'শান্তি কল্যাণ কবিতা', 'নিজনত রাতির শব্দ', 'মৌনতার শব্দ', 'অরূপ কথার জঁকা', 'কালান্তরর কবিতা', 'ধূলিয়রি ভরির সাঁচ', 'দিচাং মুখর পেঁপা', 'তুমি মোক স্পর্শ করা' আর বাংলা কবিতা-সংকলন 'খসেছে শৌখিন পালক'। তাঁর অনুবাদ কাব্যগুলি হলো 'প্রিজন ডায়েরি', 'নাজিম হিকমতের দুষ্প্রাপ্য কবিতা', 'ইয়ানিজ রিৎসসের কবিতা', 'ফয়েজ আহ্‌ম্মদ ফয়েজ-এর কবিতা', 'নিকোলাস গিয়েনের কবিতা', 'কস্টিস পাপংগোসের কবিতা' 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' প্রভৃতি। প্রবন্ধগ্রন্থ — 'চিন্তা আরু মনীষা', 'অন্তরঙ্গ অনুভব', 'লেখকর অভিপ্রায় আরু কালচেতনা', 'চেতনার বৈভব', 'কালপুরুষের তরবারি' (বাংলা প্রবন্ধ-সংকলন)। অসমিয়া ভাষায় আত্মকথা 'দিন বোর মোর সোণর সঁজাত। অসমিয়া ও বাংলা মিলিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট চল্লিশ।

যেসব সম্মান ও পুরস্কারে রবীন্দ্র সরকার ইতিমধ্যেই ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে রঘুনাথ চৌধুরী পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, দামল সম্মান এবং নবকান্ত বরুয়া সম্মান।

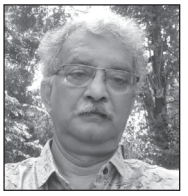

২০২২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী মৃদুল দাশগুপ্ত

মৃদুল দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৫৫ সালের ৩ এপ্রিল, পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর-এ। বাবা জ্যোৎস্নাকুমার ও মা সান্ত্বনা, স্ত্রী মাধবী এবং আত্মজা মন্দাক্রান্তা।

শিক্ষা পূর্ণচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ-মাধ্যমিক (বিজ্ঞান শাখা) শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজ থেকে জীবন বিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক।

কর্মজীবন সাংবাদিকতা, কর্মস্থল সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকা, দৈনিক সংবাদপত্র যুগান্তর ও আজকাল।

বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থা থেকে কবিতা লেখা শুরু। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'জলপাইকাঠের এসরাজ' (১৯৮৩), 'এ ভাবে কাঁদে না' (১৯৮৬), 'গোপনে হিংসার কথা বলি' (১৯৮৮), 'সূর্যাস্তে নির্মিত গৃহ' (১৯৯৮), 'ধানখেত থেকে' (২০০৭), 'সোনার বুদ্বুদ' (২০১০), 'আগুনের অবাক ফোয়ারা' (২০২০)। ছড়ার বই 'ঝিকিমিকি ঝিরিঝিরি' (১৯৯৭), 'আমপাতা জামপাতা' (১৯৯৯), 'ছড়া ৫০' (২০০১), 'রঙিন ছড়া' (২০০৮), 'খেলাচ্ছড়া' (২০১৭)। গল্পগ্রন্থ 'পার্টি বলেছিল ও সাতটি গল্প' (২০১৯)। এ ছাড়া রয়েছে 'নির্বাচিত কবিতা' (১৯৯৯), 'কবিতা সমগ্র' (২০১৫), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (২০২১)।

মৃদুলের প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কবিতা সহায়' (২০০২), 'সাতপাঁচ' (২০০৯), 'ফুল ফল মফস্সল' (দুই খণ্ড, ২০১৮, ২০১৯)।

ইতিমধ্যেই মৃদুল যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে রয়েছে 'ন্যাশনাল রাইটার্স অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৪), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পুরস্কার (২০০০) এবং 'রবীন্দ্র পুরস্কার' (২০১২)। ডাকটিকিট সংগ্রহ তাঁর অন্যতম শখ।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

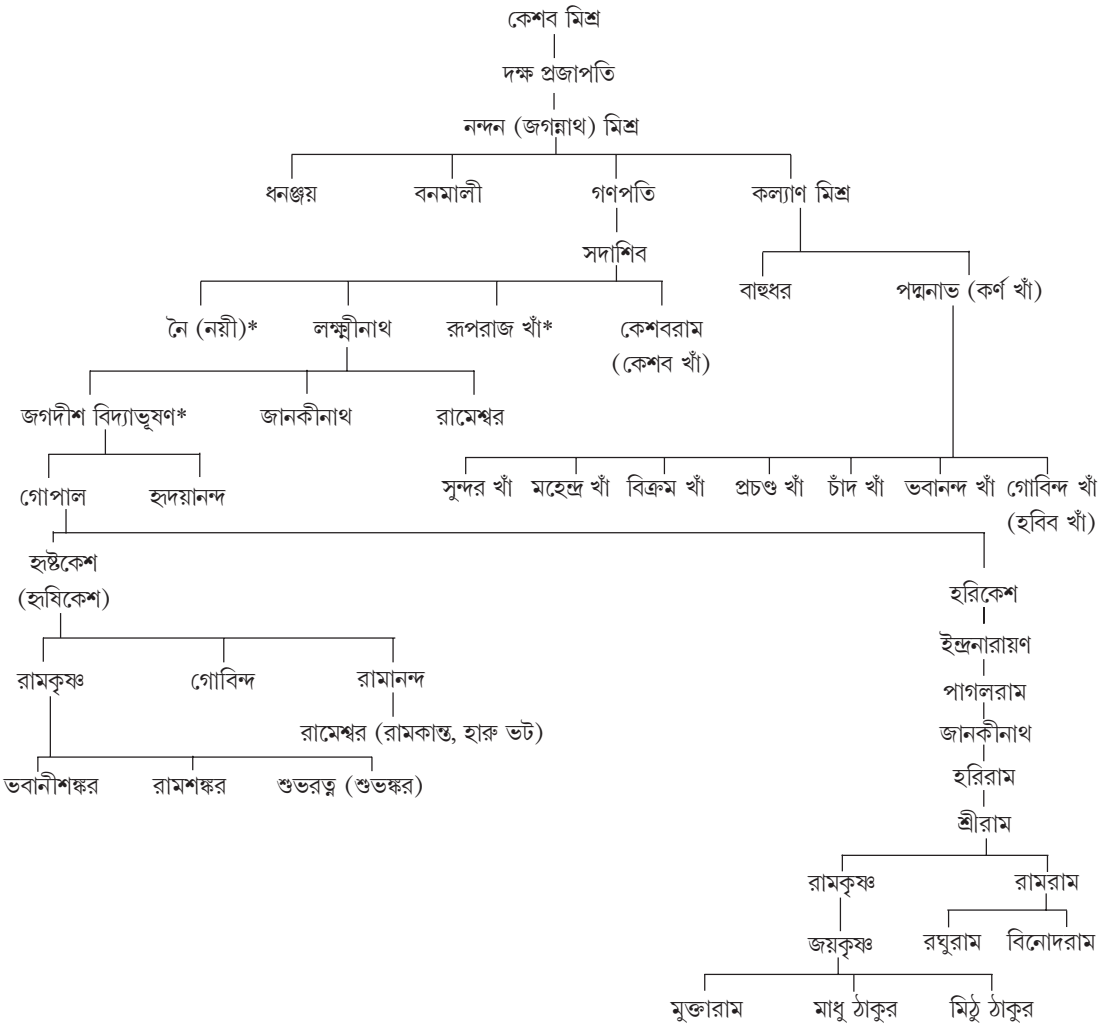

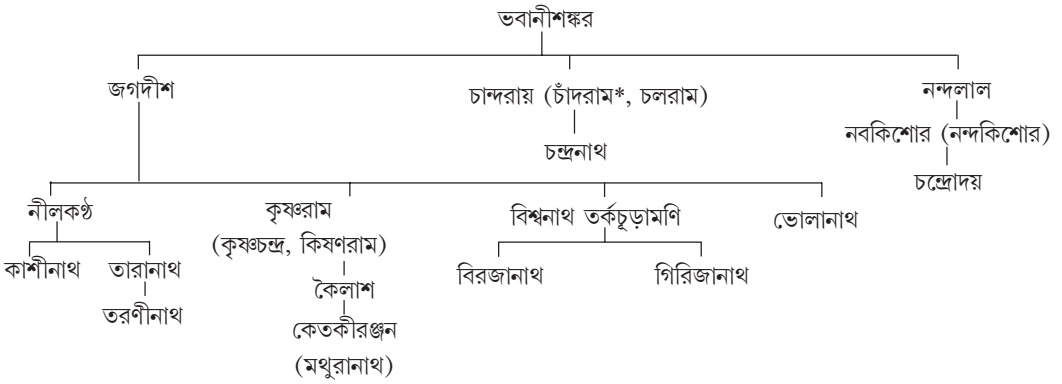
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

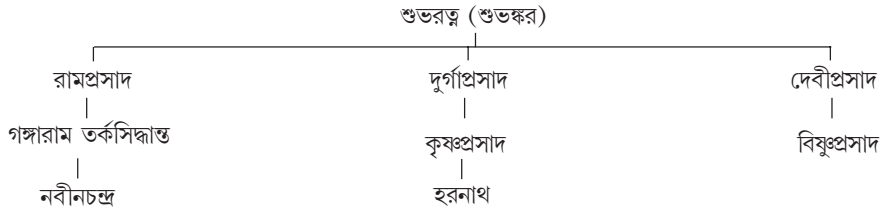
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

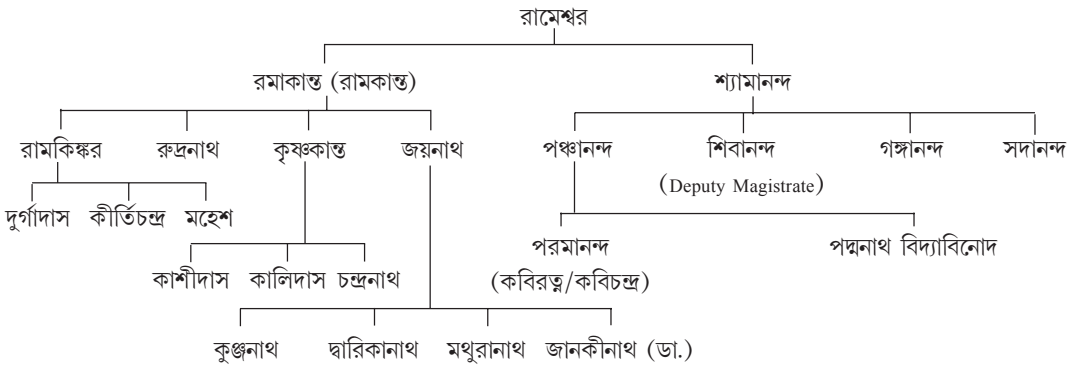
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

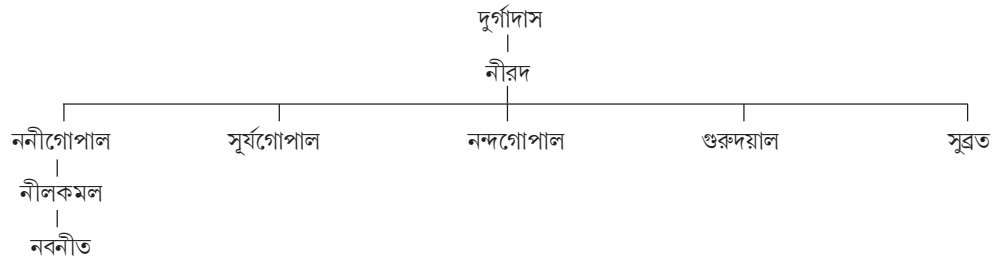
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

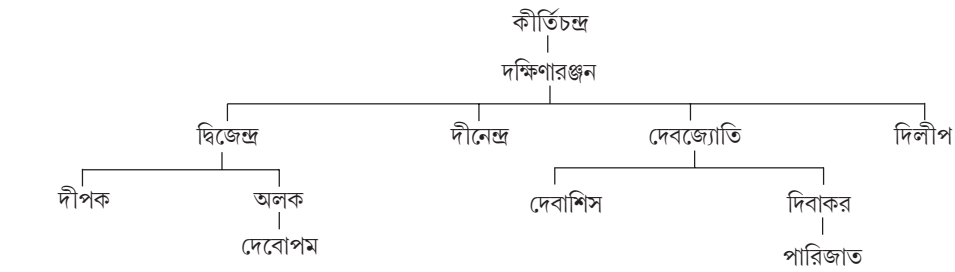
কীর্তিচন্দ্র
দক্ষিণারঞ্জন
দ্বিজেন্দ্র
দীনেন্দ্র
দেবজ্যোতি
দিলীপ
দীপক
অলক
দেবোপম
দেবাশিস
দিবাকর
পারিজাত

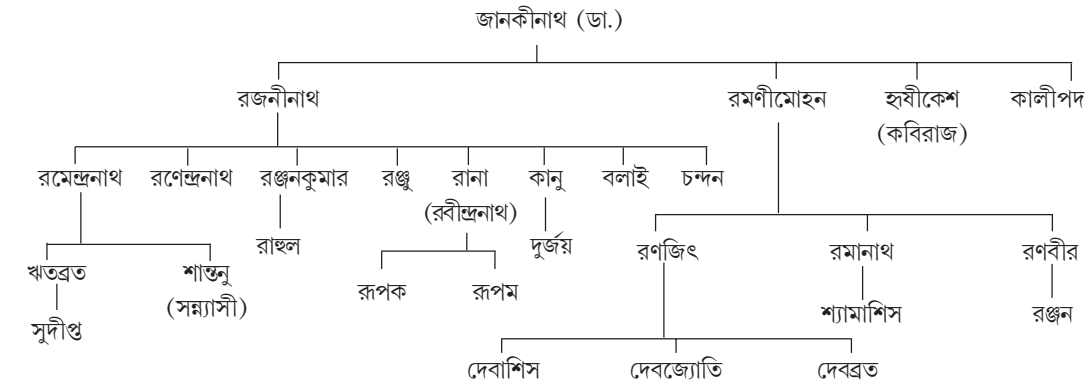
জানকীনাথ (ডা.)
রজনীনাথ
রমণীমোহন
হৃষীকেশ (কবিরাজ)
কালীপদ
রমেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
রঞ্জনকুমার
রঞ্জু
রানা (রবীন্দ্রনাথ)
কানু
বলাই
চন্দন
ঋতব্রত
শান্তনু (সন্ন্যাসী)
রাহুল
দুর্জয়
রণজিৎ
রমানাথ
রণবীর
সুদীপ্ত
রূপক
রূপম
শ্যামাশিস
রঞ্জন
দেবাশিস
দেবজ্যোতি
দেবব্রত

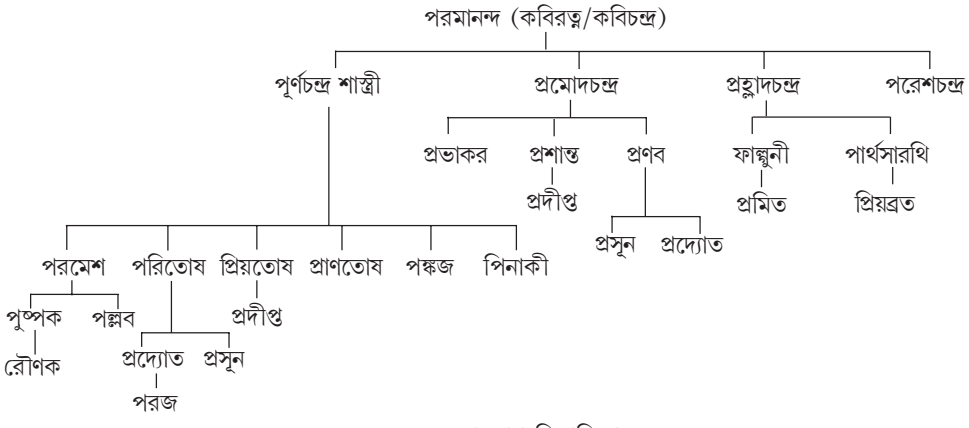
পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
প্রমোদচন্দ্র
প্রহ্লাদচন্দ্র
পরেশচন্দ্র
প্রভাকর
প্রশান্ত
প্রণব
ফাল্গুনী
পার্থসারথি
প্রদীপ্ত
প্রমিত
প্রিয়ব্রত
প্রসূন
প্রদ্যোত
পরমেশ
পরিতোষ
প্রিয়তোষ
প্রাণতোষ
পঙ্কজ
পিনাকী
পুষ্পক
পল্লব
প্রদীপ্ত
রৌণক
প্রদ্যোত
প্রসূন
পরজ

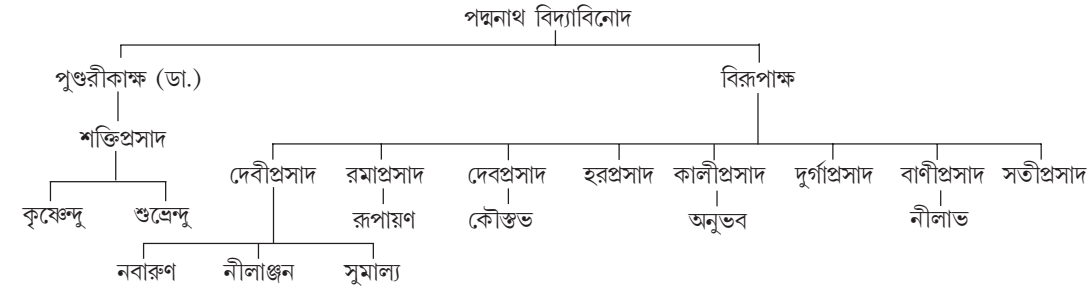
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
বিরূপাক্ষ
শক্তিপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
রমাপ্রসাদ
দেবপ্রসাদ
হরপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
বাণীপ্রসাদ
সতীপ্রসাদ
কৃষ্ণেন্দু
শুভ্রেন্দু
রূপায়ণ
কৌস্তভ
অনুভব
নীলাভ
নবারুণ
নীলাঞ্জন
সুমাল্য

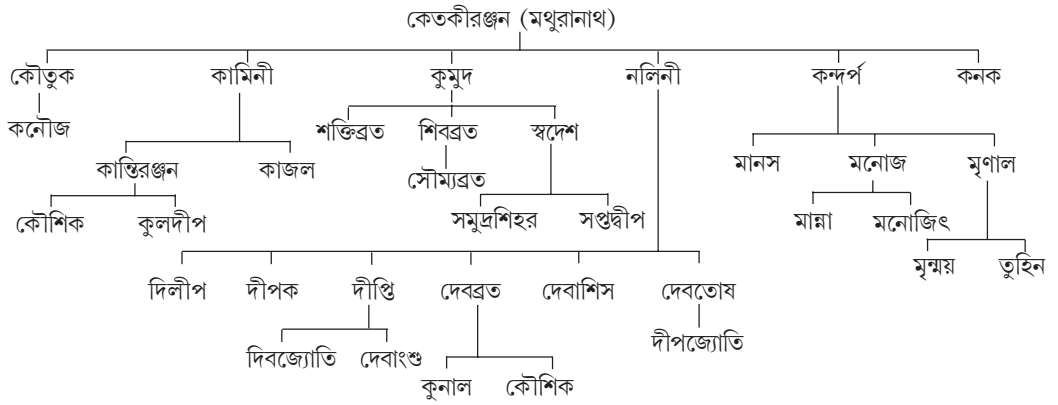
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
সৌম্যব্রত
স্বদেশ
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক

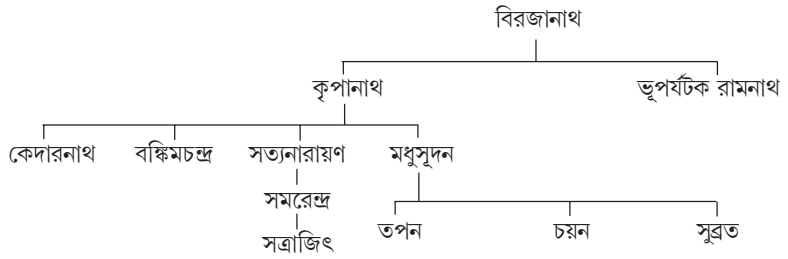
বিরজানাথ
কৃপানাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত
ভূপর্যটক রামনাথ

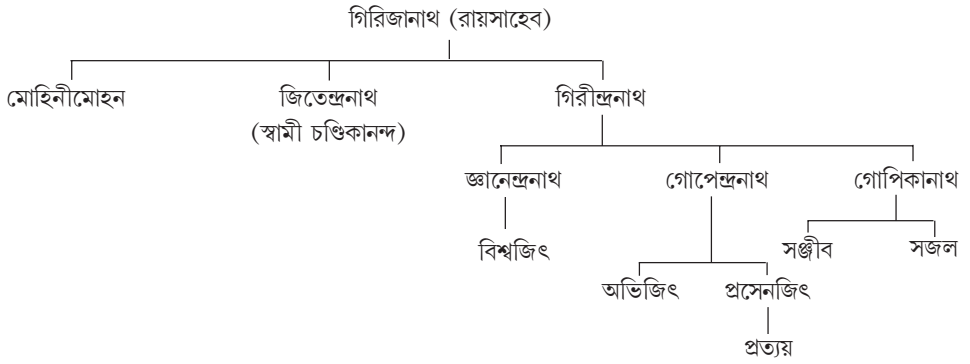
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল

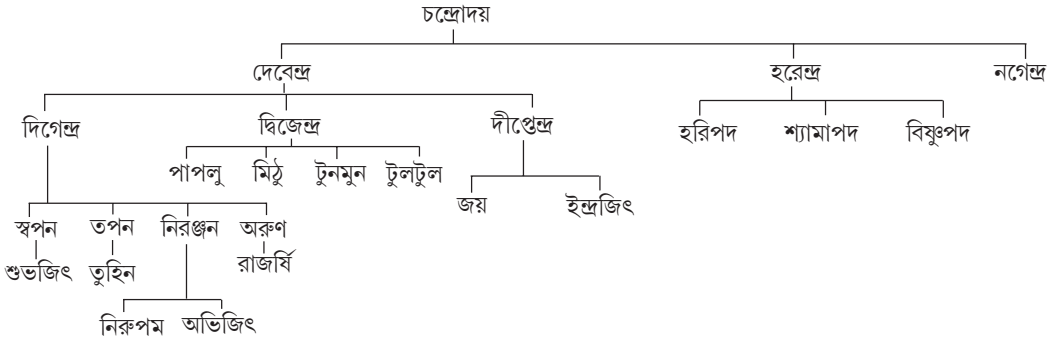
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

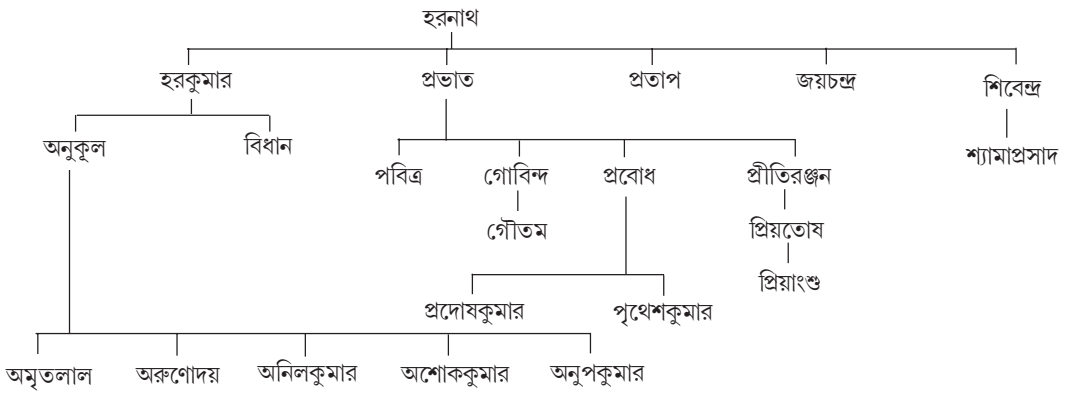

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে— এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতক থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি

শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তাঁর কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ইতিপূর্বে ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। অবশ্য দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়!

তবে ২০১৬ সালের জানুআরি মাসে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভাত বিশ্বাসের পৌত্র শ্রী প্রদোষকুমার বিশ্বাস (যিনি বর্তমানে কোচবিহারবাসী এবং সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সহ তাঁর অনুজ পৃথেশকুমার, জ্যাঠতুতো ভাই গৌতম, খুড়তুতো ভাই প্রিয়তোষ ও তস্য পুত্র প্রিয়াংশুর নাম ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এসএমএস করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীমান প্রদোষ নিজেই আমার ফোন নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছেন। এ বড় আহ্লাদের কথা। বলা বাহুল্য, উক্ত তথ্য কুলপঞ্জিতে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তা ছাড়া, দেশবিভাগ-জনিত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত রজনীনাথ ভট্টাচার্যের কয়েকজন উত্তরপুরুষের নাম বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিতে ইতিপূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়নি। বানিয়াচং বিদ্যাভূষণপাড়া নিবাসী আমার অনুজ জ্ঞাতি শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস ব্যাকরণতীর্থের প্রচেষ্টায় নামগুলি সঠিকভাবে উদ্ধার করা গেছে এবং ২০১৭ সাল থেকে কুলপঞ্জিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ❑